প্রকাশক : **হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ**
কাজলা, রাজশাহী।
ফোন ও ফ্যাক্স : (অনুঃ) (০৭২১) ৮৬১৩৬৫।
হা. ফা. বা. প্রকাশনা : ২২

النظريات الثلاثة (التقليد الأعمى والعلمانية والسياسة هي الدين)

تأليف: د. محمد أسد الله الغالب

الناشر: حديث فاؤنديشن بنغلاديش

(مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة و النشر)

১ম প্রকাশ : জানুয়ারী ১৯৮৭, যুবসংঘ প্রকাশনী।

২য় সংস্করণ : ফেব্রুয়ারী ২০১০ হা. ফা. বা. প্রকাশনা
ছফর ১৪৩১ হিঃ
মাঘ-ফাল্গুন ১৪১৬ বাং।

কম্পোজ : **হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স**
কাজলা, রাজশাহী।

মুদ্রণ: সোনালী প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজিং লিঃ, সপুরা, রাজশাহী, ফোনঃ ৭৬১৮৪২।

নির্ধারিত মূল্য : ২৫ (পঁচিশ) টাকা মাত্র।

TINTI MOTOBAD by **Dr. Muhammad Asadullah Al-Ghalib**, Professor of Arabic, University of Rajshahi. Published by **Hadeeth Foundation Bangladesh,** Kajla, Rajshahi, Bangladesh, Ph & Fax: (0721) 861365; 760525. Price : Tk. 25.00 only.

সূচীপত্র (المحتويات)

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلى على رسوله الكريم أما بعد:

তিনটি মতবাদ

[বিগত ২২শে অক্টোবর ’৮৬ সকাল ৮-টায় রাজশাহী মহানগরীর রাণীবাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে’র তিনদিন ব্যাপী কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সম্মেলনের প্রথম দিনে ছাত্র-শিক্ষক-ওলামায়ে কেরাম ও সুধী সমাবেশে সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব যে উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন, তার প্রশ্নোত্তর পর্বটি ‘পরিশিষ্ট’ অংশ হিসাবে নিম্নে প্রদত্ত হ’ল। উল্লেখ্য যে, মূল ভাষণটি ‘সমাজ বিপ্লবের ধারা’ নামে ইতিপূর্বে প্রকাশ করতে পারায় আমরা আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করছি। -প্রকাশক]

ইসলামী সমাজ বিপ্লবের পূর্বোক্ত[১] তিন দফা কর্মপন্থা বাস্তবায়নের পূর্বে আমাদেরকে অবশ্যই পুরাতন ও আধুনিক কয়েকটি মতবাদ সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকতে হবে। দ্বাদশ শতাব্দী হিজরীর আরবীয় সংস্কারক ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব (১১১৫-১২০৬ হি:/১৭০৩-১৭৯০খৃ:) রাসূলুল্লাহ (*ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম*)-এর আগমনের প্রাক্কালে আরবে প্রচলিত একশত প্রকার জাহেলিয়াতের কথা উল্লেখ করেছেন। আমরা সেখান থেকে মাত্র একটি এবং আধুনিক কালের দু’টি পরস্পর বিরোধী চরমপন্থী মতবাদের উল্লেখ করব।

---

১. উক্ত তিন দফা কর্মপন্থা ‘সমাজ বিপ্লবের ধারা’ নামে প্রকাশিত বইয়ে দেখুন। -প্রকাশক।

১ম মতবাদ : তাক্বলীদ

(النظرية الأولى : التقليد)

নির্ভেজাল ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সবচাইতে বড় বাধা হ'ল তাক্বলীদে শাখছী বা অন্ধ ব্যক্তিপূজা। এর ফলে মানুষ আর একজন মানুষের অন্ধ অনুসারী হয়ে পড়ে। অনুসরণীয় ব্যক্তির ভুল-শুদ্ধ সব কিছুকেই সে সঠিক মনে করে। এমনকি তার যে কোন ভুল হ'তে পারে এই ধারণাটুকুও অনেক সময় ভক্তের মধ্যে লোপ পায়। মানুষ যুগে যুগে কখনো তার বাপ-দাদার আমল থেকে চলে আসা রসম-রেওয়াজের অনুসারী হয়েছে, কখনো কোন সাধু ব্যক্তি অথবা ধর্মনেতার অনুসারী হয়েছে। ফলে নবীদের মাধ্যমে আল্লাহ প্রেরিত ঐশী সত্যকে সত্য বলে স্বীকার করেও অনেকে তা মানতে ব্যর্থ হয়েছে শুধুমাত্র তাক্বলীদী গোঁড়ামীর কারণে। বলা বাহুল্য প্রত্যেক নবীকেই স্ব স্ব সমাজের প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠানের মুকাবিলা করতে হয়েছে। আল্লাহ প্রেরিত 'অহি'র সত্যকে প্রচার করতে গিয়ে সমাজের লালিত সত্যের (?) বিরোধিতা করতে হয়েছে। ফলে কখনো তাঁদের মার খেতে হয়েছে, কখনো অগ্নি পরীক্ষা দিতে হয়েছে, কখনো দেশ ছাড়তে হয়েছে, কখনো জীবন দিতে হয়েছে। পবিত্র কুরআনে এই মর্মে বহু আয়াত বর্ণিত হয়েছে। যেমন হযরত নূহ *(আলাইহিস সালাম)* যখন তাঁর কওমকে আল্লাহ্র ইবাদত ও নবীর এত্বা'আত বা অনুসরণের আহ্বান জানালেন, তখন তারা তা মানতে অস্বীকার করল এবং যাতে তারা তাদের অনুসরণীয় ধর্মনেতা অদ, সুওয়া', ইয়াগূছ, ইয়া'ঊক্ব, নাস্র প্রমুখের অনুসরণ থেকে বিরত না হয়, তজ্জন্য যিদ করল *(নূহ ৭১/২৩)*। সুদীর্ঘ সাড়ে নয়শত বছর পরম ধৈর্যের সঙ্গে দাওয়াত দিয়ে (অনধিক মাত্র চল্লিশ বা আশি জনের) মুষ্টিমেয় কয়েকজন ভাগ্যবান ব্যক্তি নবীর আহ্বানে সাড়া দেন। বাকী সবাই প্রচলিত তাক্বলীদী কুসংস্কারের জালে আবদ্ধ থাকে। অবশেষে আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে পাঠানো এক ব্যাপক গযবে দুনিয়া গারত হয়ে যায়।

পরবর্তীকালে পিতা ইবরাহীম, মূসা, ঈসা ও আমাদের নবী মুহাম্মাদ *(ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)* সকলকেই এই তাক্বলীদী গোঁড়ামীর মুকাবিলা করতে হয়েছে। প্রত্যেক নবীর কওম স্ব স্ব বাপ-দাদার দোহাই পেড়ে নবীর আনীত সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَـــا، أَوَلَـــوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا وَّلاَ يَهْتَدُوْنَ-

'যখন তাদেরকে বলা হয়েছে আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার অনুসরণ কর, তখন তারা বলেছে, বরং আমরা বাপ-দাদার আমল থেকে যা পেয়ে আসছি, তারই অনুসরণ করব। যদিও তাদের বাপ-দাদারা এসবের কিছুই জ্ঞান রাখত না বা হেদায়াতপ্রাপ্ত ছিল না' *(বাক্বারাহ ২/১৭০)*।

তাক্বলীদের সংজ্ঞা (معنى التقليد) :

তাক্বলীদ 'ক্বালাদাতুন' শব্দ থেকে ব্যুৎপত্তি লাভ করেছে। যার অর্থ কণ্ঠহার বা রশি। 'ক্বাল্লাদাল বা'ঈরা' (قلد البعير) 'সে উটের গলায় রশি বেঁধেছে'। সেখান থেকে মুক্বাল্লিদ, যিনি নিজের গলায় কারো আনুগত্যের রশি বেঁধে নিয়েছেন। পারিভাষিক অর্থে 'নবী ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির কোন শারঈ সিদ্ধান্তকে বিনা দলীলে মেনে নেওয়াকে 'তাক্বলীদ' বলা হয়। মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন, التقليد قبول قول الغير بلا دليل فكأنه لقبوله جعلـــه قـــلادة فى عنقـــه 'অন্যের কোন কথা বিনা দলীলে গ্রহণ করার নাম 'তাক্বলীদ'। এইভাবে গ্রহণ করার ফলে ঐ ব্যক্তি যেন নিজের গলায় রশি পরিয়ে নিল'।[২]

২. মোল্লা আলী ক্বারী প্রণীত শরহ ক্বাছীদাহ আমালী-র বরাতে হাক্বীক্বাতুল ফিক্বহ (বোম্বাই : দাঊদ রায কর্তৃক সংশোধিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, তাবি) পৃঃ ৪৪।

তাক্বলীদ ও ইত্তেবা (التقليد والإتباع) :

অনেকেই দু'টি পরিভাষাকে এক করে দেখতে চান। অথচ দু'টির মধ্যে রয়েছে মৌলিক প্রভেদ। 'তাক্বলীদ' হ'ল নবী ব্যতীত অন্য কারো শারঈ বক্তব্যকে বিনা দলীলে কবুল করা। পক্ষান্তরে ছহীহ দলীল অনুযায়ী নবীর অনুসরণ করাকে বলা হয় 'ইত্তেবা'। একটি হ'ল দলীল ছাড়াই অন্যের রায়ের অনুসরণ, অন্যটি হ'ল দলীলের অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহ্‌র অনুসরণ। অন্য কথায় 'তাক্বলীদ' হ'ল রায়ের অনুসরণ, 'ইত্তেবা' হ'ল 'রেওয়ায়াতে'র অনুসরণ। এক্ষণে কারু রায়ের অনুসরণ ও দলীলের অনুসরণের মধ্যে যে অন্ধকার ও আলোর পার্থক্য, তা আশা করি কাউকে বুঝিয়ে বলতে হবে না।

তাক্বলীদ ও ইত্তেবার আরবী সংজ্ঞা নিম্নরূপ :

◈ التَّقْلِيْدُ هُوَ قُبُوْلُ قَوْلِ الغَيْرِ بِلاَ دَلِيْلٍ وَالْإِتِّبَاعُ هُوَ قُبُوْلُ قَوْلِ الغَيْـــرِ مَـــعَ دَلِيْلٍ–

◈ التَّقْلِيْدُ إِنَّمَا هُوَ قُبُوْلُ الرَّأىِ وَالْإِتِّبَاعُ إِنَّمَا هُوَ قُبُوْلُ الرِّوَايَةِ، فَالْإِتِّبَاعُ فِى الدِّيْنِ مَسُوْغٌ وَالتَّقْلِيْدُ مَمْنُوْعٌ (القول المفيد للشوكانى ص١٤)–

ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন, 'তাক্বলীদ হ'ল রায়-এর অনুসরণ এবং 'ইত্তেবা' হ'ল রেওয়ায়াতের অনুসরণ। ইসলামী শরী'আতে 'ইত্তেবা' সিদ্ধ এবং 'তাক্বলীদ' নিষিদ্ধ'।[৩]

একথা পরিষ্কার যে, ইসলাম মানব জাতিকে আল্লাহ প্রেরিত সত্য গ্রহণ ও তাঁর নবীর ইত্তেবা করতে আহ্বান জানিয়েছে। কোন মানুষের ব্যক্তিগত রায়ের অনুসরণ কখনই করতে বলেনি। কোন মানুষ যেহেতু ভুলের ঊর্ধ্বে নয়, তাই মানব রচিত কোন মতবাদই, সে মতবাদ ধর্মীয়, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক যাই-ই হোক না কেন, প্রকৃত সত্যের সন্ধান দিতে পারে না। সেই মতবাদে পৃথিবীতে শান্তিও আসতে পারে না। আর এজন্যেই নবী ব্যতীত অন্যের তাক্বলীদ নিষিদ্ধ এবং নবীর ইত্তেবা মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে অপরিহার্য।

---

৩. শাওকানী, আল-ক্বাওলুল মুফীদ (মিসরী ছাপা ১৩৪০/১৯২১ খৃ:) পৃঃ ১৪।

মুসলিম সমাজে তাক্বলীদের আবির্ভাব

(نشأة التقليد فى المجتمع الإسلامى)

ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনে এযামের যুগ শেষে দ্বিতীয় শতাব্দী হিজরীর পরে মুসলিম সমাজে সৃষ্ট অনৈক্য ও বিভ্রান্তির যুগে তাক্বলীদের আবির্ভাব ঘটে।[৪] তবে বিভিন্ন উসতায ও ইমামের তাক্বলীদের ভিত্তিতে সৃষ্ট বিভিন্ন মাযহাবী দলের উদ্ভব ঘটে চতুর্থ শতাব্দী হিজরীতে। যেমন ভারতগুরু শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (১১১৪-১১৭৬ হি:/১৭০৩-১৭৬২ খৃ:) বলেন,

إعلم أنَّ الناسَ كانوا قبلَ المائةِ الرابعةِ غيرَ مُجْمَعين على التقليـــد الخـــالص لمذهبٍ واحدٍ بعينه–

'জেনে রাখ (হে পাঠক!) চতুর্থ শতাব্দী হিজরীর আগের লোকেরা কোন একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির একক মাযহাবী তাক্বলীদের উপরে সংঘবদ্ধ ছিল না'।[৫] হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (৬৯১-৭৫১ হি:) বলেন,

إنما حدثت هذه البدعةُ فى القرنِ الرابع المذمومِ على لسان رسول الله صلى الله عليه و سلم–

'তাক্বলীদের এই বিদ'আত আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)-এর যবানে নিন্দিত চতুর্থ শতাব্দী হিজরীতে আবির্ভূত হয়'। অতঃপর তিনি তাক্বলীদের বিরুদ্ধে ৮১টি দলীল পেশ করেছেন।[৬]

---

৪. আবু ইয়াহ্ইয়া শাহজাহানপুরী, আল-ইরশাদ ইলা সাবীলির রাশাদ (দিল্লী: ১৩১৯হিঃ), পৃঃ ৩৮।

৫. শাহ অলিউল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ (মিসর : খায়রিয়াহ প্রেস, ১৩২২ হিঃ), ১ম খণ্ড পৃঃ ১২২, লাইন ১২; ঐ, (কায়রো : দারুত তুরাছ ১৩৫৫ হিঃ) পৃঃ ১৫২, লাইন ২৫।

৬. ইবনুল ক্বাইয়িম, ই'লামুল মুওয়াককি'ঈন (বৈরুত : দারুল জীল ১৯৭৩ খৃঃ) ২য় খণ্ড পৃঃ ২০৮; ঐ, পৃঃ ২০৮-২৭৫।

স্বর্ণযুগে মুসলমানদের অবস্থা ও বর্তমান যুগ

(حكاية حال المسلم فى العصر الذهبى وفى العصر الحاضر)

চতুর্থ শতাব্দী হিজরীতে বিভিন্ন মাযহাবী দলের উদ্ভবের আগে মুসলমানগণ কিভাবে চলতেন? তাদের ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে কিভাবে সমাধান হ'ত? প্রশ্নটি বর্তমানে মাযহাবী পরিবেশে আমাদের মনে জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক। এ প্রসঙ্গে শাহ অলিউল্লাহ (১১১৪-১১৭৬ হি:) ও ইমাম গাযযালী (৪৫০-৫০৫ হি:)-এর বক্তব্যের সার সংক্ষেপ নিম্নে প্রদত্ত হ'ল-

'চতুর্থ শতাব্দী হিজরীর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী লোকদের অবস্থা' (باب حكاية حال الناس قبل المائة الرابعــة و بعـــدها) এই শিরোনামে শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) বলেন, 'তৎকালীন সময়ে কোন মুসলমান কোন তাক্বলীদী মাযহাবের উপরে সংঘবদ্ধ ছিলেন না। তাদের মধ্যে আলেম যেমন ছিলেন, সাধারণ লোকও তেমনি ছিল। সাধারণ লোকেরা তাদের পিতামাতা বা স্থানীয় আলেমগণের নিকট হ'তে ধর্মীয় বিষয়াদি জেনে নিত। যে কোন আলেম হৌক তাঁর কাছ থেকে ফৎওয়া জিজ্ঞেস করত। এ ব্যাপারে কারও মাযহাব যাচাই করা হ'ত না। আলেমগণের অবস্থা ছিল এই যে, যখন কোন বিষয়ে তাঁরা ছহীহ হাদীছ বা আছারে ছাহাবা পেয়ে যেতেন, শর্তহীনভাবে তার উপরে আমল করতেন। দেখতেন না যে, এই হাদীছটি কোন আলেম বা কতজন আলেম গ্রহণ করেছেন। যখন কোন ব্যাপারে তাদের নিকট দলীল স্পষ্ট হ'ত না, তখন বিগত কোন বিদ্বানের ফৎওয়া তালাশ করতেন। যখন কোন ব্যাপারে দুই ধরনের উক্তি পেয়ে যেতেন, তখন অধিকতর নির্ভরযোগ্য উক্তিটি গ্রহণ করতেন।

কিন্তু এই সুন্দর নিরপেক্ষ যুগ শেষ হয়ে যাবার পরে লোকেরা ডাইনে বামে চলে গেল। তারা ফিক্বহ সংক্রান্ত বিষয়ে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হ'ল। যার বিবরণ ইমাম গাযযালী (রহঃ) দিয়েছেন এভাবে-

খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ শেষ হবার পরে ইসলামী খেলাফতের শাসনক্ষমতা এমন লোকদের কুক্ষিগত হয়ে পড়ে, যারা শরী'আত সংক্রান্ত

বিষয়ে ছিলেন অনভিজ্ঞ। ফলে তারা সকল ব্যাপারে আলেমদের উপরে নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। তখনও আলেমদের মধ্যে এমন কিছু আলেম ছিলেন, যাঁরা স্বর্ণযুগের বিদ্বানদের ন্যায় জ্ঞানী ও গুণী ছিলেন। তাঁরা বিদ্যা, প্রজ্ঞা ও সরলতার মূর্ত প্রতীক ছিলেন। কোন সরকারী পদে তলব করা হ'লে তাঁরা পালিয়ে যেতেন বা প্রত্যাখ্যান করতেন। ফলে সব ধরনের মানুষের শ্রদ্ধা কুড়াতে তাঁরা সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য হ'লেও সত্য যে, সে সময়েও এমন অনেক আলেম ছিলেন, যারা তাদের ইল্‌মকে দুনিয়াবী ইয্‌যত ও পদমর্যাদা হাছিলের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করেন। ফলে তারা সমাজের শ্রদ্ধা হারালেন। এভাবে একদিন যারা আহূত হ'তেন, এখন তারা আহ্বানকারী হয়ে গেলেন (فأصبح الفقهـــاءُ بعـــد أن كـــانوا مطلوبين طالبين)। সরকারী পদ এড়িয়ে চলার ফলে তারা যে মর্যাদা হাছিল করেছিলেন, তা গ্রহণের ফলে তারা তদোধিক মর্যাদাহীন হয়ে পড়লেন।

ইতিপূর্বেই (গ্রীকদের অনুকরণে) মুসলিম পণ্ডিতগণ কালাম শাস্ত্রের কুটতর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন। আর এভাবেই আলেমদের মধ্যে ঝগড়ার সূত্রপাত ঘটে। (এই সুযোগে) খলীফাগণ বিশেষ করে হানাফী-শাফেঈ বিতর্কে ইন্ধন যোগাতে শুরু করেন। উভয়পক্ষে বহু ঝগড়া-বিবাদ ও লেখনী পরিচালিত হ'ল। এ অবস্থা এখনও চলছে। আল্লাহ জানেন ভবিষ্যতের লিখন কি আছে'।[৭]

অতঃপর শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী বলেন, আলেমদের এই ফের্কাবন্দীর ফলে সাধারণ মুসলমান যেকোন আলেমের নিকট হ'তে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র ফায়ছালা তলব করার চিরন্তন রীতি পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয় এবং যে কোন একটি মাযহাবের তাক্বলীদ করেই নিশ্চিন্ত হ'তে চেষ্টা করে। লোকদের অন্তরে তাক্বলীদ এখন এমনভাবে আসন গেড়েছে, যেমনভাবে পিঁপড়া সবার অলক্ষ্যে দেহে ঢুকে কামড়ে পড়ে থাকে'।[৮]

---

৭. উল্লেখ্য যে, ইমাম গাযযালীর মৃত্যুর দেড় শতাধিক বৎসর পরে ৬৫৬ হিজরীতে এই হানাফী-শাফেঈ ও শী'আ-সুন্নী দ্বন্দ্বের সুযোগে হালাকু খাঁ কর্তৃক বাগদাদের ইসলামী খেলাফত ধ্বংস হয়।-লেখক ।

৮ . হুজ্জাতুল্লাহ, মিসরী ছাপা ১/১২২-২৩ পৃঃ ।

শাহ অলিউল্লাহ (রহঃ) ও ইমাম গাযযালী (রহঃ) তাক্বলীদী বিদ‘আত আবিষ্কারের পূর্বে মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থার যে বাণীচিত্র অংকন করেছেন, তাতে আশা করি যে কোন নিরপেক্ষ জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য চিন্তার যথেষ্ট খোরাক আছে।

‘আমি অজ্ঞ সে কারণে আমাকে যে কোন একটি মাযহাবের তাক্বলীদ করতেই হবে’ একথা বলে তাক্বলীদের পক্ষে যে যুক্তি পেশ করা হয়ে থাকে, তার উত্তরও উপরের আলোচনায় এসে গেছে। জেনে রাখা ভাল যে, জানা ও না জানার বিষয়টি একটি আপেক্ষিক ব্যাপার মাত্র। দু’জন বিজ্ঞ আলেমকেও দেখা যাবে যে, একই সময়ে একটি বিষয় একজনের জানা আছে, অপরজনের জানা নেই। ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যেও এরূপ ছিল। এমনকি উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব মহামতি চার খলীফা হযরত আবুবকর, ওমর, ওছমান এবং আলী (রাঃ) অনেক হাদীছ না জানার কারণে অন্যান্য ছাহাবীর নিকট থেকে জেনে নিয়ে ফায়ছালা দিতেন। হাদীছের পৃষ্ঠাসমূহে যার ভুরি ভুরি প্রমাণ মওজুদ রয়েছে।[৯] এ যুগেও যদি আমাদের কোন বিষয়ে জানা না থাকে, তাহ’লে আমরাও কোন আলেমের নিকট থেকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ফায়ছালা জেনে নিব। কেবল একটি বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, প্রশ্নকারী কেবল কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকেই ফায়ছালা চাইবেন, কোন মাযহাবের বা কোন ব্যক্তির নিজস্ব সিদ্ধান্ত নয়। এমনিভাবে যিনি ফৎওয়া দিবেন, তিনিও কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকেই ফৎওয়া দিবেন। না জানা থাকলে বলবেন, আমি জানি না। নিজের রায় অনুযায়ী ফৎওয়া দিলে সেটাও প্রশ্নকারীকে বলে দিবেন। মোটকথা আলেমের কর্তব্য এটাই হবে যে, প্রশ্নকারীকে কুরআন ও হাদীছ অনুযায়ী ফৎওয়া দিয়ে তাকে জান্নাতের পথ বাৎলে দেওয়া। এ ব্যাপারে যদি তাকে জান-মাল, ইযযত ও পদমর্যাদার ঝুঁকি নিতে হয়, তাও নিতে হবে। তথাপি সমাজের ভয়ে বা লৌকিকতার কারণে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সিদ্ধান্ত সমাজকে জানিয়ে দেওয়ার পবিত্র দায়িত্ব থেকে পিছিয়ে আসা চলবে না। এ

৯. দ্রঃ ইমাম ছালেহ ফুল্লানী (১১৬৬-১২১৮হিঃ) প্রণীত ‘ঈক্বাযু হিমাম’ (বৈরুত : দারুল মা’রিফাহ, ১৩৯৮/১৯৭৮ খৃঃ) পৃঃ ৬-৯, ৮৭-৮৮; ইবনুল ক্বাইয়িম, ই‘লামুল মুওয়াক্কি‘ঈন, ২য় খণ্ড পৃঃ ২৭০-৭২।

ব্যাপারে নবী করীম (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টান্ত সর্বদা সামনে রাখতে হবে। যেমন শাহ অলিউল্লাহ স্বীয় ‘ইনছাফ’ গ্রন্থে বলেন,

و قد تواتر عن الصحابة والتابعين أنهم كانوا إذا بلغهم الحديث يعملون بـــه من غير أن يلاحظوا شرطا–

‘ছাহাবা ও তাবেঈন হ’তে অব্যাহত ধারায় বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁদের নিকট হাদীছ পৌঁছে গেলে তাঁরা বিনা শর্তে তার উপরে আমল করতেন’।[১০]

তাক্বলীদ-এর পরিণাম (عاقبة التقليد)

(১) তাক্বলীদের সর্বাপেক্ষা বড় কুফল হ’ল দলীল বিমুখতা। মুক্বাল্লিদ ব্যক্তি আলেম হউক বা জাহিল হউক, কুরআন ও হাদীছ হ’তে সরাসরি জ্ঞান আহরণ করার অধিকার তার থাকে না। তাকে স্বীয় ইমাম বা মাযহাবী ফৎওয়া অনুসারে কথা বলতে হয়। এই দলীল বিমুখতার ফলে প্রায় হাযার বছর পূর্বেকার বিভিন্ন ক্বিয়াসী সিদ্ধান্ত, যার কোন কোনটি কুরআন ও হাদীছের সরাসরি বিরোধী, ইসলামের নামে মুসলমানের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় এবং যা আজও চলছে।

(২) তাক্বলীদের ফলে অনুসরণীয় ব্যক্তির প্রতি যেমন সৃষ্টি হয় অন্ধ ভক্তি, বিরোধী মতের প্রতি সৃষ্টি হয় তেমনি অন্ধ বিদ্বেষ। আর এর ফলেই সৃষ্টি হয় পারস্পরিক বিভেদ ও দলাদলি। এক ও অখণ্ড মুসলিম মিল্লাত বিভিন্ন মাযহাবী দল ও উপদলে বিভক্ত হওয়ার মূল কারণ হ’ল এই তাক্বলীদ। ৬৫৬ হিজরীতে বাগদাদের ইসলামী খেলাফতের নির্মম পরিণতি, ৮০১ হিজরীতে সৃষ্ট কা‘বা শরীফে চার মাযহাবের জন্য চার মুছাল্লা কায়েমের বিদ‘আত এবং আজও মুসলিম সমাজে বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক বিষয়ে যে পারস্পরিক অনৈক্য বিরাজ করছে, তার অধিকাংশেরই মূল কারণ হ’ল তাক্বলীদী অসহিষ্ণুতা। এক্ষণে আমরা যদি সত্যিকার অর্থে মুসলিম ঐক্য কামনা করি, তাহ’লে প্রত্যেকের সকল যিদ ও অহমিকা ছেড়ে দিয়ে শরী‘আতের আওতাধীন জীবনের সকল ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ

১০. শাহ অলিউল্লাহ, আল-ইনছাফ ফী বায়ানে আসবাবিল ইখতেলাফ (বৈরুত: দারুন নাফাইস, ১৯৭৭ খৃঃ) পৃঃ ৭০।

হাদীছের সিদ্ধান্তকে নিঃশর্তভাবে মেনে নিতে হবে। আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদেশ-নিষেধকে বিনাশর্তে গ্রহণ করার একটিমাত্র শর্ত যদি আমরা পূরণ করতে পারি, তাহ'লে ইনশাআল্লাহ শতধা বিচ্ছিন্ন মুসলিম উম্মাহ পুনরায় একটি অখণ্ড মহাজাতিতে পরিণত হবে। বলা বাহুল্য, যুগে যুগে আহলেহাদীছ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য সেটাই।

(৩) তাক্বলীদের অনুসারী ব্যক্তি স্পষ্ট ছহীহ হাদীছ পাওয়া সত্ত্বেও তা মানতে পারেন না কেবল এই কারণে যে, হাদীছটি তাঁর মাযহাবের অনুকূলে নয়। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছের উপরে বিদ্বানগণের সিদ্ধান্তকে অগ্রাধিকার দানকারী ব্যক্তি কখনোই মুমিন হ'তে পারে না *(নিসা ৪/৬৫)।*

(৪) মুক্বাল্লিদ ব্যক্তি এক ইমামের তাক্বলীদ কতে গিয়ে বাস্তবে অসংখ্য বিদ্বানের মুক্বাল্লিদ হয়ে পড়েন। ফলে বিনা দলীলে ফৎওয়া গ্রহণের সুযোগে ধর্মের নামে সমাজে সৃষ্টি হয়েছে রকমারি শিরক ও বিদ'আত। অথচ যার নামে মাযহাবী ফৎওয়া প্রদান করা হচ্ছে, গবেষণায় দেখা যাবে যে, তিনি এ সবের নাড়ী-নক্ষত্রও খবর রাখেন না।[১১]

(৫) তাক্বলীদের সর্বাপেক্ষা মারাত্মক পরিণতি হ'ল ইজতিহাদ বা শরী'আত গবেষণার দুয়ার বন্ধ হয়ে যাওয়া। যেমন বাহরুল উলূম আবদুল আলী লাক্ষ্ণৌবী (মৃ: ১২২৫হিঃ/১৮১০খৃঃ) বলেন,

---

১১. *যেমন মুহাম্মাদ আল-মুঈন সিন্ধী বলেন,*

وليس كل ما يُنسَب إليهم (أى الائمة الأربعة) من القياسات البعيدة التى تشبه التشريع الجديد و يُنقَل فى كتب مذهبهم فهو ثابت النسبة إليهم بل أكثر ذالك أو كله مما ارتكبه من غلب عليه الرأى من أتباعهم الخ–

'চার ইমামের দিকে সম্বন্ধ করে মাযহাবী কিতাবসমূহে যে সকল দূরতম ক্বিয়াসী মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে, যা নতুন শরী'আত রচনার শামিল, তা প্রমাণিত নয়। বরং তার অধিকাংশ কিংবা সবটুকুই তাঁদের অনুসারীদের নিজস্ব রায় মাত্র'। - দিরাসাতুল লাবীব (লাহোর : বায়তুস সালত্বানাহ ১২৮৪/১৮৬৮ খৃঃ) পৃঃ ১৫৬। বরং ইবনু দাক্বীকুল ঈদ (মৃ: ৭০২হি:) বলেন, نسبة هذه المسائل إلى الأئمة المجتهـــدين حـــرام 'এই মাসআলাগুলি মুজতাহিদ ইমামহগণের প্রতি সম্বন্ধ করা হারাম' (ঈক্বাযু হিমাম, পৃঃ ৯৯)।

و اما الاجتهاد المطلق فقالوا اختتم بالأئمة الأربعة حتى اوجبوا تقليد واحد من هؤلاء على الأمة و هذا كله هوس من هوساقم لم يأتوا بدليل ولايُعْبـــأ بكلامهم–

অর্থঃ 'তারা বলেন, মুৎলাক্ব ইজতিহাদ ইমাম চতুষ্টয় পর্যন্ত শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন এঁদের যে কোন একজনের তাক্বলীদ করা উম্মতের উপর ওয়াজিব। অথচ এ সব কথা লোকদের খোশখেয়াল মাত্র। এ সবের কোন দলীল তারা পেশ করেনি এবং তাদের কথার কোন তোয়াক্কা করা যাবে না'।[১২] অতএব অনাগত ভবিষ্যতের অসংখ্য সমস্যার সমাধান হিসাবে ইসলামকে পেশ করতে হ'লে 'ইজতিহাদ' যে অবশ্যই যরূরী, সে কথা যে কোন নিরপেক্ষ বিদ্বান এক বাক্যে স্বীকার করবেন আশা করি।

তাক্বলীদের বিরোধিতায় চার ইমাম
(الأئمة الأربعة خلاف التقليد)

অনেকের ধারণা প্রসিদ্ধ চার ইমাম প্রচলিত চার মাযহাবের জন্মদাতা এবং তাঁরাই একমত হয়ে চার মাযহাবের যে কোন একটির অনুসরণ উম্মতের জন্য ফরয (?) করে গিয়েছেন। এমনকি ঈমান-একীনের মেহনতের নামে 'চিল্লাহ'তে গিয়েও তাবলীগী ভাইয়েরা কবিতাকারে তাদের লোকদের ১৩০ ফরযের মধ্যে চার মাযহাবকেও চার ফরয হিসাবে তা'লীম দিয়ে থাকেন ও মুখস্ত করিয়ে থাকেন।[১৩] নিম্নে প্রদত্ত মাননীয় ইমাম ছাহেবদের জন্ম-মৃত্যু সন ও তাঁদের উক্তিগুলি বিচার করলেই উপরের ধারণাগুলির অসারতা বুঝা যাবে।

---

১২. আবদুল আলী. ফাওয়াতেহুর রাহমূত শরহ মুছাল্লামুছ ছুবূত (লাক্ষ্ণৌ: নওলকিশোর প্রেস ১২৯৫/১৮৭৮ খৃঃ) পৃঃ ৬২৪।

১৩. ইঞ্জিনীয়ার মু.জু.আ. মজুমদার রচিত 'এক মুবাল্লেগের পয়লা নোট বই' (ঢাকা-৫, পপুলার প্রিন্টিং প্রেস, নিউমার্কেট, অক্টোবর ১৯৭৮) পৃঃ ৪৭।

এক নযরে চার ইমাম :

নাম	জন্ম	মৃত্যু	প্রাপ্ত বয়স	জন্মস্থান
আবূ হানীফা নু'মান বিন ছাবিত (রহঃ)	৮০ হিঃ	১৫০ হিঃ	৭০ বছর	ইরাকের কূফা নগরী
মালিক বিন আনাস (রহঃ)	৯৩ হিঃ	১৭৯ হিঃ	৮৬ বছর	মদীনা শরীফ
মুহাম্মাদ বিন ইদরীস আশ-শাফেঈ (রহঃ)	১৫০ হিঃ	২০৪ হিঃ	৫৪ বছর	সিরিয়ার (বর্তমান ফিলিস্তীন) গাযা এলাকায় জন্ম, বসবাস মক্কায়
আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)	১৬৪ হিঃ	২৪১ হিঃ	৭৭ বছর	বাগদাদ নগরী

১. ইমাম আবু হানীফা (৮০-১৫০ হিঃ) বলেন,

إِيَّاكم والقولَ في دين الله تعالى بالرأيِ وعليكم باتباع السنةِ فَمَنْ خرج عنها ضَلَّ– 'তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে নিজ নিজ রায় অনুযায়ী কথা বলা হ'তে বিরত থাক, তোমাদের জন্য সুন্নাতের অনুসরণ করা অপরিহার্য। যে ব্যক্তি সুন্নাতের অনুসরণ থেকে বেরিয়ে যাবে, সে পথভ্রষ্ট হবে।[১৪] তিনি আরও বলেন,

حرامٌ على مَنْ لم يَعْرِفْ دليلى أن يُفْتِيَ بكلامى– 'আমার কথা অনুযায়ী ফৎওয়া দেওয়া হারাম ঐ ব্যক্তির জন্য যে আমার গৃহীত দলীল সম্পর্কে অবগত নয়'।[১৫]

এখানে বুযর্গ ইমাম সকলকে তাঁর তাক্বলীদ করতে নিষেধ করেছেন এবং তাঁর গৃহীত দলীল যাচাই করে সেই অনুযায়ী ফৎওয়া দেওয়ার অনুমতি

১৪. আব্দুল ওয়াহ্হাব শা'রানী (৮৯৮-৯৭৩হিঃ) কিতাবুল মীযান (দিল্লী : আকমালুল মাতাবে, ১২৮৬ হিঃ) ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৩, লাইন ১৮।

১৫. ঐ, লাইন ২২।

দিচ্ছেন। তিনি তাঁর কথার নয় বরং দলীলের অনুসরণ করতে বলেছেন। যাকে ইত্তেবায়ে সুন্নাত বলা হয়, তাক্বলীদে ইমাম নয়।

অতঃপর ইমাম আবু হানীফার দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা শ্রবণ করুন, তিনি বলেন, إذا صَحَّ الحديثُ فهو مذهبى 'যখন ছহীহ হাদীছ পাবে, জেনো সেটাই আমার মাযহাব'।[১৬] وكان إذا أَفْتَى يقولُ هذا رأى أبى حنيفةَ وهو أحسنُ ما قدَّرنا عليه فمن جاء بأحسنَ منه فهو أولَى بالصواب– 'তিনি ফৎওয়া দিলে বলে দিতেন যে, এটি আবু হানীফার রায়। আমাদের সাধ্যপক্ষে এটিই উত্তম মনে হয়েছে। এর চেয়ে উত্তম পেলে সেটিই সঠিকতর বলে গণ্য হবে'।[১৭]

২. ইমাম মালিক (৯৩-১৭৯ হিঃ) বলেন,

إنما أنا بشر أُخطى وأُصيب فانظُروا فى رائى فكلُّ ما وافقَ الكتابَ والسنةَ فخذُوه وكلُّ ما لم يُوَافِقْ فاتْرُكوه–

'আমি একজন মানুষ মাত্র। আমি ভুল করি, সঠিকও বলি। অতএব আমার সিদ্ধান্তগুলি তোমরা যাচাই কর। যেগুলি কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী পাও, সেগুলি গ্রহণ কর, যেগুলি না পাও, সেগুলি পরিত্যাগ কর'।[১৮]

তিনি মূলনীতির আকারে বলেন, ما من أَحَدٍ إلا ومأخوذٌ من كلامه ومردودٌ عليه إلا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم– 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যতীত দুনিয়াতে এমন কোন ব্যক্তি নেই, যার সকল কথা গ্রহণীয় অথবা

১৬. ইবনু আবেদীন, শামী রাদ্দুল মুহতার শরহ দুর্রে মুখতার (দেউবন্দ: ১২৭২হিঃ) ১/৪৬ পৃঃ ; ঐ, (বৈরুতঃ দারুল ফিক্র ১৩৯৯/১৯৭৯) ১/৬৭-৬৮ পৃঃ ; শা'রানী, কিতাবুল মীযান ১/৬৬ পৃঃ ; লাক্ষ্ণৌবী, মুক্বাদ্দামা শরহ বেক্বায়াহ (দেউবন্দ ছাপা, তাবি) ১৪ পৃঃ ৬ষ্ঠ লাইন।

১৭. কিতাবুল মীযান, ১ম খণ্ড ৬৩ পৃঃ ।

১৮. ইউসুফ জয়পুরী, হাক্বীক্বাতুল ফিক্বহ (বোম্বাই :পরিবর্ধিত সংস্করণ, তাবি) পৃঃ ৭৩।

বর্জনীয়।[১৯] অন্য বর্ণনায় এসেছে, إلا صاحبُ هذه الروضة 'এই কবরবাসী ব্যতীত'।[২০]

৩. ইমাম শাফেঈ (১৫০-২০৪ হিঃ) বলেন,

إذا رأيتم كلامى يُخَالِفُ الحديثَ فاعْمَلُوا بالحديث واضْرِبُوا بكلامى الحائطَ و قال يوماً للمُزَنِى يا إبراهيمُ لا تُقَلِّدْنِى فى كلِّ ما أقولُ وانظُــرْ فى ذالــك لنفسك فانه دينٌ–

'যখন তোমরা আমার কোন কথা হাদীছের বরখেলাফ দেখবে, তখন হাদীছের উপর আমল করবে এবং আমার কথাকে দেওয়ালে ছুঁড়ে মারবে'। তিনি একদা স্বীয় ছাত্র ইবরাহীম মুযানীকে বলেন, 'হে ইবরাহীম! তুমি আমার সকল কথার তাক্বলীদ করবে না। বরং নিজে চিন্তা-ভাবনা করে দেখবে। কেননা এটা দ্বীনের ব্যাপার'।[২১]

৪. ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (১৬৪-২৪১ হিঃ) বলেন,

لا تُقَلِّدْنِى ولا تُقَلِّدَنَّ مالكاً ولا الأوزاعِىَّ ولا النَّخْعِىَّ ولا غيرَهــم و خُــذِ الأحكامَ من حَيْثُ أَخذُوا من الكتابِ والسنة-

'তুমি আমার তাক্বলীদ কর না। তাক্বলীদ কর না ইমাম মালেক, আওযাঈ, নাখ্ঈ বা অন্য কারও। বরং নির্দেশ গ্রহণ কর কুরআন ও সুন্নাহ্র মূল উৎস থেকে, যেখান থেকে তাঁরা সমাধান গ্রহণ করতেন'।[২২]

মহামতি চার ইমামের উপরোক্ত বক্তব্য সমূহের পর আমরা দ্বাদশ শতকের ইমাম মুহাম্মাদ বিন আলী শাওকানী (১১৭২-১২৫০ হিঃ)-এর একটি আলোচনা উপহার দিয়েই অধ্যায়ের উপসংহার টানব ইনশাআল্লাহ। ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন,

و قد علم كل عالم أنهم (أى الصحابة والتابعين و تــابعيهم) لم يكونــوا مقلدين ولا منتسبين إلى فرد من أفراد العلماء بل كان الجاهل يسئل العــالم

১৯. শাহ ওয়ালিউল্লাহ, ইক্বদুল জীদ উর্দূ অনুবাদসহ(লাহোর: তাবি)৯৭ পৃঃ ৩য় লাইন।
২০. কিতাবুল মীযান ১/৬৪ পৃঃ।
২১. ইক্বদুল জীদ ৯৭ পৃঃ ৭ম লাইন।
২২. ইক্বদুল জীদ, ৯৮ পৃঃ ৩য় লাইন।।

عن الحكم الشرعى الثابت فى كتاب الله أو بسنة رسوله صــلى الله عليــه وسلم فيفتيه به و يرويه له لفظا أو معنى فيعمل بذلك من بــاب العمــل بالرواية لا بالرأى و هذا أسهل من التقليد–

'প্রত্যেক বিদ্বান এ কথা জানেন যে, ছাহাবা, তাবেঈন ও তাবে তাবেঈন কেউ কারো মুক্বাল্লিদ ছিলেন না। ছিলেন না কেউ কোন বিদ্বানের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত। বরং জাহিল ব্যক্তি আলেমের নিকট থেকে কিতাব ও সুন্নাহ হ'তে প্রমাণিত শরী'আতের হুকুম জিজ্ঞেস করতেন। আলেমগণ সেই মোতাবেক ফৎওয়া দিতেন। কখনও শব্দে শব্দে বলতেন, কখনও মর্মার্থ বলে দিতেন। সে মতে লোকেরা আমল করত (কুরআন ও হাদীছের) রেওয়ায়াত (বর্ণনা) অনুযায়ী, কোন বিদ্বানের রায় অনুযায়ী নয়। বলা বাহুল্য, কারও তাক্বলীদ করার চেয়ে এই তরীকাই সহজতর'।[২৩]

মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন,

ومن المعلوم أن الله تعالى ما كلَّف أحدا أن يكون حنفيا أو مالكيا أو شافعيا و حنبليا بل كلَّفهم أن يعملوا السنة (معيار الحق صــ٥٣، حقيقة الفقــه ٨٥)–

'এটা জানা কথা যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা কাউকে বাধ্য করেননি এজন্যে যে, সে হানাফী, মালেকী, শাফেঈ বা হাম্বলী হৌক। বরং বাধ্য করেছেন এজন্য যে, তারা সুন্নাত অনুযায়ী আমল করুক'। বলা বাহুল্য আহলেহাদীছ আন্দোলনের মূল কথা এটাই।

উপরের আলোচনা সমূহ হ'তে এ কথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, বিগত কোন ইমামই পরবর্তীকালে সৃষ্ট বিভিন্ন মাযহাবী ফের্কাবন্দীর জন্য দায়ী ছিলেন না, বরং দায়ী আমরাই। যেমন হযরত ঈসা (আঃ)-কে 'ইলাহ' বানানোর জন্য তিনি দায়ী ছিলেন না। দায়ী ছিল পরবর্তীকালে তাঁর কিছু সংখ্যক তথাকথিত ভক্তের দল।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে তাক্বলীদী সংকীর্ণতা হ'তে মুক্তি দিয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র নিরপেক্ষ অনুসরণের মাধ্যমে নির্ভেজাল ইসলামী সমাজ কায়েমের তাওফীক দান করুন-আমীন!

২৩. শাওকানী, আল-ক্বাওলুল মুফীদ (মিসরী ছাপা ১৩৪০/১৯২১ খৃঃ), পৃঃ ১৫।

২য় মতবাদ : ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ

(النظرية الثانية: العلمانية)

Religion should not be allowed to come into politics. It is merely a matter between man and god. 'ধর্মকে রাজনীতির অঙ্গনে প্রবেশাধিকার দেওয়া উচিত নয়। এটি মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যকার একটি (আধ্যাত্মিক) বিষয় মাত্র'।

Secularism বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মূল কথাটি উপরোক্ত দু'টি বাক্যের মধ্যে নিহিত। দীর্ঘ প্রায় দু'শত বছরের গোলামীর যুগে বৃটিশ বেনিয়া দার্শনিকদের শিখানো 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' নামক এই মতবাদটি সাফল্যজনকভাবে চালু করার ফলেই সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজরা সদ্য রাজ্যহারা মুসলিম শক্তিকে নিরুৎসাহিত করতে এবং সুদীর্ঘকাল যাবৎ ভারত উপমহাদেশ শাসন করতে সক্ষম হয়েছিল। বর্তমানে উপমহাদেশে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ কয়েকটি স্বাধীন দেশ হওয়া সত্ত্বেও সেখানে রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিকগুলি চালু না থাকার অন্যতম প্রধান কারণ হ'ল বৃটিশের রেখে যাওয়া উপরোক্ত মতবাদ। ফলে মুসলিম দেশে বাস করেও আমরা অমুসলিম দেশ সমূহের গৃহীত আইন অনুযায়ী শাসিত হচ্ছি। পৃথিবীতে প্রত্যেকটি দেশ তাদের জনগণের লালিত কৃষ্টি ও সংস্কৃতি মোতাবেক রাষ্ট্রীয় আইন ব্যবস্থা গড়ে তুলে ও সেই অনুযায়ী দেশ শাসন করে থাকে। কম্যুনিষ্ট দেশগুলি তাদের অধিকাংশ জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কম্যুনিষ্ট পার্টির গৃহীত আইনের লৌহ কঠিন শৃংখলে শাসিত হচ্ছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য মুসলিম দেশগুলির জন্য যে, এই দেশগুলির শাসন ব্যবস্থায় তাদের নিজস্ব তাহযীব ও তামাদ্দুনের প্রতিফলন নেই। বরং দেশের সংবিধানে অনৈসলামী শাসন দর্শনের গোলামীর চেহারা প্রকটভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। তথাকথিত উদারতাবাদের দোহাই পেড়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' নামক উক্ত মতবাদটির প্রচলন ঘটানো হয়েছে। যার মূল কথাই হ'ল রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ধর্মের অর্থাৎ ইসলামের কোন বিধান

চলবে না। বরং জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত পার্লামেন্টের গুটিকয়েক গুণী ও নির্গুণ সদস্য কিংবা সামরিক ডিক্টেটর প্রেসিডেন্ট নিজের খেয়াল-খুশীমত যা আইন করে দিবেন, সেটাই দেশের আইন বলে সকলকে মেনে নিতে হবে। পৃথিবীতে ইসলাম ব্যতীত অন্য যতগুলি ধর্ম আছে, কারো নিকট আল্লাহ প্রেরিত অভ্রান্ত রাষ্ট্রীয় বা অর্থনৈতিক দর্শন বা হেদায়াত মওজূদ নেই। তাই একথা নির্বিবাদে বলা যায় যে, 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' নামে সৃষ্ট উক্ত মতবাদটি কেবলমাত্র ইসলামকেই মুসলমানের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন থেকে বের করে দেবার জন্য ইহুদী-নাছারা বুদ্ধিজীবীদের মাধ্যমে তৈরী করা হয়েছে।

বস্তুত:পক্ষে উনবিংশ শতকে আবিস্কৃত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের এই আধুনিক মতবাদটি অন্যান্য ধর্মের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হ'লেও বিশ্ব ইতিহাসের অতুলনীয় রাজনৈতিক দলীল 'মদীনার সনদ'-এর রচয়িতা ও ঐতিহাসিক 'হোদায়বিয়ার সন্ধি'তে স্বাক্ষরদানকারী কুশাগ্রবুদ্ধি রাজনীতিবিশারদ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (*ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম*)-এর প্রচারিত ও আল্লাহ প্রেরিত পূর্ণাঙ্গ শরী'আত ইসলামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বরং অন্যান্য ধর্মের বিপরীতে ইসলামী শরী'আতে মানুষের আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক উভয় জীবনের জন্য চিরন্তন হেদায়াত সমূহ মওজূদ রয়েছে। যা যথাযথভাবে মেনে নেওয়ার মধ্যেই মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মুক্তি নির্ভর করে।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের কুফল

(عاقبة العلمانية)

১. 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ'-এর প্রধান লক্ষ্য হ'ল ইসলামকে মানুষের বৈষয়িক জীবন থেকে বিতাড়িত করে আধ্যাত্মিক জীবনে বন্দী করে ফেলা। অতঃপর সেখান থেকেও ক্রমে ক্রমে বিদায় করে দিয়ে মানুষকে পুরা নাস্তিক ও বস্তুবাদী করে তোলা। এই লক্ষ্যের প্রথম স্তরে তারা অত্যন্ত দ্রুত সফলতা লাভ করেছে এবং মুসলিম বিশ্বের প্রায় সর্বত্র বর্তমানে এই দর্শন নামে-বেনামে রাষ্ট্রীয়ভাবেই চালু হয়ে গেছে। চূড়ান্ত স্তরের মহড়াও প্রায় সব

দেশেই কিছু কিছু চলছে সে সব দেশের কম্যুনিষ্ট ও সমাজতন্ত্রী দলগুলির মাধ্যমে ও তাদের প্রচারিত সাহিত্য-সাময়িকী, বই ও পত্র-পত্রিকা তথা প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া সমূহের মাধ্যমে।

২. এই দর্শনের ফলে মুসলমানরা ইসলামকে অপূর্ণ ও বিকলাঙ্গ ভাবতে শুরু করেছে। ফলে চৌদ্দশ' বছরের পুরনো ইসলাম এ যুগে অচল বলতেও মুসলিম শিক্ষিত সন্তানের জিহ্বা আড়ষ্ট হয় না। বরং উল্টা অপবাদ ছড়ানো হয় যে, ইসলামী আইন ব্যবস্থায় অমুসলিমদের জন্য কোন বিধান নেই।

৩. এই দর্শনের মারাত্মক কুফল হিসাবে মুসলমান তার আধ্যাত্মিক জীবনে আল্লাহ্‌র আইন ও বৈষয়িক জীবনে নিজের জ্ঞান বা প্রবৃত্তিকে ইলাহ-এর আসনে বসিয়েছে। আল্লাহ বলেন,

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُوْنُ عَلَيْهِ وَكِيْلاً- أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُوْنَ أَوْ يَعْقِلُوْنَ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيْلاً-

'(হে নবী!) আপনি কি দেখেছেন ঐ ব্যক্তিকে, যে স্বীয় প্রবৃত্তিকে ইলাহ গণ্য করেছে? আপনি কি ঐ লোকটির কোন দায়িত্ব নিবেন? আপনি কি মনে করেন ওদের অধিকাংশ লোক শুনে বা বুঝে? ওরা তো চতুষ্পদ জন্তুর মত বরং তার চেয়েও অধম' *(ফুরক্বান ২৫/৪৩, ৪৪)*।

৪. এই দর্শনের বাস্তব ফলশ্রুতি হিসাবে আমাদের নেতারা রাজনীতির মঞ্চে দাঁড়িয়ে সোচ্চার গলায় শিরকী কালাম উচ্চারণ করে বলেন, 'জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস'। একই কারণে সূদভিত্তিক হারামী অর্থনীতি রাষ্ট্রীয়ভাবে চালু করতে এবং দেশবাসীকে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় 'হারামখোর' বানাতেও আমাদের মুসলিম নেতাদের অন্তর আল্লাহ্‌র গযবের ভয়ে প্রকম্পিত হয় না। স্বীয় পদমর্যাদার অপব্যবহার করে লাখ লাখ ঘুষের টাকা পকেটে ভরতেও এদের হাত কাঁপে না। ডাক্তারের চেয়ারে বসে অসহায় রোগীর পকেট ডাকাতি করতেও এদের বিবেকে বাধে না। মাল মওজূদ

করে ইচ্ছাকৃতভাবে কৃত্রিম খাদ্যসংকট সৃষ্টি করতেও এরা জাহান্নামের ভয়ে ভীত হয় না। জুয়া-লটারী আর স্মাগলিংয়ের হারামী পয়সায় খাবার কিনে নিষ্পাপ কচি মা'ছূম বাচ্চার মুখে তুলে দিতেও এদের পাষাণ পিতৃহৃদয় ভয়ে আঁৎকে ওঠে না। কারণ তার বিশ্বাস অনুযায়ী এ সবই হ'ল বৈষয়িক ব্যাপার। এখানে আবার জান্নাত-জাহান্নাম কি? তাই একজন লোক মসজিদে পাক্কা মুছল্লী এবং 'আলহাজ্জ' লকব নিয়ে জীবন কাটিয়ে দিলেও বৈষয়িক ব্যাপারে তার কোনই প্রভাব পড়বে না, যদি নাকি ঐ ব্যক্তি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদে বিশ্বাসী হয়। তার দ্বীন তার দুনিয়ার উপরে কোন প্রভাব বিস্তার করবে না। ঐ ব্যক্তি হবে তখন পুরা দুনিয়াদার। দুনিয়াবী লাভ-লোকসানই হবে তার সকল কাজের নৈতিক মানদণ্ড। যাঁরা দেশের রাজনৈতিক ও বৈষয়িক ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামান না বরং আলীশান খানক্বাহে বসে মা'রেফাতের সবক দেন কিংবা বার্ষিক ওরস- ঈছালে ছওয়াব ও প্রাত্যহিক নযর-নেয়াযের দৈনিক ব্যালান্স হিসাব করায় সদা ব্যস্ত থাকেন, তারাই এদেশে 'দ্বীনদার' বলে খ্যাত। জানি না ইসলামের মহান নবী (ছাঃ) ও তাঁর চারজন খলীফাকে এরা দ্বীনদার বলবেন, না 'দুনিয়াদার' বিশেষণে বিশেষিত করবেন।

আমরা যারা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী সমাজ গঠনের শপথ নিয়েছি, নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের অগ্রসেনা হিসাবে আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রত্যেক কর্মীকে উপরোক্ত জাহেলী মতবাদটি সম্পর্কে সর্বদা হুঁশিয়ার থাকতে হবে এবং নিজেকে ও নিজের পরিবার ও সমাজকে এই ইসলাম ধ্বংসকারী খৃষ্টানী মতবাদ হ'তে এবং এই মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেদের জান, মাল, সময় ও শ্রম ব্যয় করা হ'তে বিরত থাকতে হবে।[২৪]

---

২৪. আল্লামা ইকবাল (১৮৭৩-১৯৩৮খৃ:) বলেন, ... جب جدا هو دين سياست سے تو ره جاتي هے چنگيزي 'যখন রাজনীতি হ'তে দ্বীন পৃথক হয়ে যাবে, তখন সেখানে কেবল চেংগীযী বর্বরতাই অবশিষ্ট থাকবে' এ কথার বাস্তবতা আজ পৃথিবীর প্রায় সকল ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই দেখা যাচ্ছে। -লেখক।

৩য় মতবাদ : রাজনীতিই ধর্ম

(النظرية الثالثة : السياسة هى الدين)

‘ধর্ম ও রাজনীতি আলাদা বস্তু’ এই মর্মের চরমপন্থী মতবাদ- ‘ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ’ উনবিংশ শতকের মাঝামাঝিতে আবিষ্কার হওয়ার কিঞ্চিদধিক একশত বৎসর পরে ‘রাজনীতিই ধর্ম’ এই মর্মের ঠিক উল্টা আর এক চরমপন্থী মতবাদের উদ্ভব ঘটে ভারতে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে। এই মতবাদটি পুরা ইসলামকেই রাজনীতি গণ্য করেছে এবং রাজনীতির আলোকে ইসলামের সকল অনুষ্ঠানকে বিচার করেছে। যেমন বলা হয়েছে,

دین در اصل حکومت کا نام ہے- شریعت اس حکومت کا قانون ہے - اور عبادت اس قانون و ضابطہ کی پابندی ہے-

‘দ্বীন আসলে হুকুমতের নাম। শরী‘আত ঐ হুকূমতের কানূন। আর ইবাদত হ’ল ঐ আইন ও বিধানের আনুগত্য করার নাম’।[২৫] অতঃপর ইবাদতের বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়ে বলা হয়েছে-

اس عبادت کی حقیقت جس کے متعلق لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ وہ محض نماز روزہ اور تسبیح و تھلیل کا نام ہے اور دنیا کے معاملات سے اس کو کچھ سروکار نہیں، حالانکہ در اصل صوم و صلوۃ اور حج و زکوۃ اور ذکر و تسبیح انسان کو اس بڑی عبادت کے لئے مستعد کرنیوالی تمرینات (Training courses) ہیں-

‘ঐ ইবাদত যে সম্পর্কে লোকেরা বুঝে রেখেছে যে, তা কেবল ছালাত-ছিয়াম, তাসবীহ ও তাহলীলের নাম, দুনিয়াবী বিষয়ে তার কোন মাথাব্যথা নেই। অথচ আসল কথা হ’ল ছালাত-ছিয়াম, হজ্জ ও যাকাত, যিক্র ও তাসবীহ সবকিছু মানুষকে উক্ত বড় ইবাদতের (হুকূমত ও অন্যান্য দুনিয়াবী বিষয়ের) জন্য প্রস্তুতকারী অনুশীলন বা ট্রেনিং কোর্স মাত্র’।[২৬]

---

২৫. খুত্বাত (দিল্লী-৬ : মারকাযী মাকতাবা ইসলামী, ১৯৮৭) পৃঃ ৩২০।

২৬. তাফহীমাত (দিল্লী-৬ : মারকাযী মাকতাবা ইসলামী, ১৯৭৯), ১ম খণ্ড ৬৯ পৃঃ ।

পর্যালোচনা

১. বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রচারিত উক্ত চরমপন্থী দর্শনের অনুসারী হওয়ার ফলে মুসলিম সমাজের একটি অংশ যেনতেন প্রকারেণ রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনকেই মূল ইবাদত ভাবতে শুরু করেছে এবং ইসলামের ফারায়েয-ওয়াজিবাত প্রভৃতিকে ‘ছোট-খাট বিষয়’ বলে ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে।

২. এই দর্শন দ্বীনকে দুনিয়া হাছিলের মাধ্যম রূপে গণ্য করেছে। অথচ ইসলামের যাবতীয় ইবাদতের মূল লক্ষ্য হ’ল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন, কোনমতেই দুনিয়া অর্জন নয়। আল্লাহ বলেন, فَأَعْبُدِ اللهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّيْنَ ‘তুমি আল্লাহ্র ইবাদত কর কেবলমাত্র তাঁরই জন্য খালেছ আনুগত্য সহকারে’ *(যুমার ৩৯/২)*।

৩. এই দর্শন স্বীয় লক্ষ্য হাছিলের জন্য কুরআনে কারীমের কয়েকটি পরিভাষার অপব্যাখ্যা করেছে। যেমন ‘দ্বীন’ অর্থ হুকূমত। ‘ইক্বামতে দ্বীন’ অর্থ ইক্বামতে হুকূমত। ‘ইবাদত’ অর্থ আনুগত্য। এখানে আল্লাহ্র উপাসনা ও সরকারের আনুগত্যকে এক করে দেখানো হয়েছে।[২৭] যার বাস্তব ফলশ্রুতিতে মানুষের নিজের নফস বা দেশের সরকার সবই মা‘বূদ-এর আসন দখল করে নিয়েছে। অথচ এই আক্বীদা পোষণ করলে অনৈসলামী সরকারের আনুগত্যকারী কিংবা নফসের পূজারী প্রত্যেক মুসলিমকে মুশরিক ও চিরস্থায়ী জাহান্নামী বলতে হয়, যা কুরআন ও হাদীছের সম্পূর্ণ বরখেলাফ মু‘তাযিলী ও খারেজী আক্বীদার সঙ্গে অনেকাংশে মিলে যায়। খারেজীদের মতে কবীরা গুনাহগার ব্যক্তি তওবা না করে মারা গেলে সে কাফের এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে।[২৮] মু‘তাযিলীদের মতে সে মুমিন নয়, কাফিরও নয়। তওবা না করে মারা গেলে সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে।

---

২৭. তাফহীমাত ১/৪৯-৬৩ পৃঃ ।

২৮. উক্ত চরমপন্থী আক্বীদার কারণেই তারা খলীফা আলী, মু‘আবিয়া ও আমর ইবনুল ‘আছ (রাঃ)-এর রক্তকে হালাল গণ্য করেছিল এবং হযরত আলীকে হত্যা করেছিল। -লেখক।

৪. ‘দ্বীন আসলে হুকূমত’ এই দর্শনটি আরেকটি দার্শনিক প্রশ্নের জন্ম দেয়। সেটি হ’ল দ্বীনের জন্য দুনিয়া, না দুনিয়ার জন্য দ্বীন? আরও একটু অগ্রসর হয়ে বলা যায় ‘ধর্মের জন্য মানুষ, না মানুষের জন্য ধর্ম’? ইসলামের মতে দ্বীনের জন্য যিনি জীবন দেন, তিনি হন ‘শহীদ’। নাস্তিক পণ্ডিতগণের মতে ধর্মের জন্য মানুষ নয়, বরং মানুষ নিজেই ধর্মকে বা আল্লাহ্‌কে সৃষ্টি করেছে (নাঊযুবিল্লাহ)। যার অর্থ দাঁড়ায় দ্বীনের জন্য দুনিয়া নয়, বরং দুনিয়ার জন্য দ্বীন।

এক্ষণে যদি দ্বীন আসলে হুকূমত হয় এবং ইসলামের বুনিয়াদী ফরয সমূহ তথা ছালাত-ছিয়াম, যাকাত-হজ্জ প্রভৃতি উক্ত হুকূমত বা রাষ্ট্র ক্ষমতা অর্জনের অনুশীলন বা ট্রেনিং কোর্স হয়, তাহ’লে এই দর্শনটি উপরোক্ত বস্তুবাদী দর্শনের সঙ্গে অনেকাংশে মিলে যায়।

এখানে আরেকটি প্রশ্ন দেখা দেয় যে, হুকূমত বা রাষ্ট্র ক্ষমতা হাছিলের পরে ছালাত-ছিয়াম ইত্যাদির ট্রেনিং কোর্স অব্যাহত থাকবে কি? এ বিষয়ে উক্ত দর্শনের মূল হোতা ইসমাঈলী শী‘আ ও গ্রীক দর্শনের উচ্ছিষ্ট ভোজী তথাকথিত ছূফীবাদের অনুসারীদের মধ্যে দু’ধরনের লোক দেখতে পাওয়া যায়। এক দলের মতে সাধনার উচ্চমার্গে পৌঁছনোর পরে কিংবা আমল ও আচরণ ভাল হয়ে গেলে, তার জন্য ইসলামের অবশ্য পালনীয় ছালাত-ছিয়াম ইত্যাদি অনুষ্ঠানাদি পালনের কোন প্রয়োজন নেই। আর একদল সর্বাবস্থায় এগুলি যরূরী মনে করেন।[২৯]

৫. এই দর্শনের অনুসারীগণ মনে করেন যে, দুনিয়ায় নবীদের আগমনের উদ্দেশ্য ছিল ‘হুকূমতে ইলাহিয়াহ’ বা আল্লাহ্‌র হুকূমত কায়েম করা। আর সেটাই হ’ল প্রকৃত তাওহীদ, যার দিকে প্রত্যেক নবী মানব জাতিকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। অতঃপর ঐ কথাটি বাদ দিয়ে কুরআনের সূরায়ে শূরার **১৩** নং আয়াতাংশের অনুকরণে ‘হুকূমতে ইলাহিয়ার’ বদলে ‘ইক্বামতে দ্বীন’ পরিভাষাটি চালু করা হয়েছে। অথচ পবিত্র কুরআনে নবী প্রেরণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে যে, তাঁরা প্রেরিত

---

২৯. বিস্তারিত দেখুনঃ ইবনু তায়মিয়াহ, আর-রাদ্দু ‘আলাল মানতেক্বিইঈন, পৃঃ ১৪৫; ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালেকীন, ১ম খণ্ড ৯৬ পৃঃ।

হয়েছিলেন দুনিয়াতে আত্মভোলা মানুষকে আল্লাহ্‌র দিকে ডাকতে। তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিতে ও জাহান্নামের ভয় দেখাতে। তাদের সামনে আল্লাহ প্রেরিত আয়াত সমূহ শুনাতে, তাদেরকে পবিত্র করতে এবং কিতাব ও সুন্নাতের শিক্ষা দিতে *(আহযাব ৩৩/৪৫-৪৬; জুম‘আ ৬২/২)।*

হুকূমত কায়েম করাই যদি নবী আগমনের উদ্দেশ্য হ’ত তাহ’লে তো বলতেই হয় যে, লক্ষাধিক নবীর মধ্যে কেবলমাত্র হযরত দাঊদ, সুলায়মান ও মুহাম্মাদ (ছাঃ) ব্যতীত আর সকলেই তাঁদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়েছিলেন (*নাঊযুবিল্লাহ*)। যে ইবরাহীম (আ:) আগুনে পুড়লেন না, তিনি কেন স্বীয় নবুঅতী শক্তি বলে নমরূদকে হটিয়ে সিংহাসনে না বসে বরং দেশ ছেড়ে চলে যাওয়াকেই উত্তম মনে করলেন। প্রথমেই সম্রাট বিরোধী শ্লোগান না দিয়ে তিনি কেন নিস্প্রাণ মূর্তিগুলোকে ভাঙ্গতে গেলেন? অত্যাচারী ফেরাঊন সদলবলে নীলনদে ডুবে মরার পরে কেন মূসা (আঃ) তার শূন্য সিংহাসন দখল করে বীরদর্পে ‘হুকূমতে ইলাহিয়াহ’ কায়েমের সুন্দর সুযোগ হাতে পেয়েও ছেড়ে দিলেন? মোর্দাকে যিন্দা করার অলৌকিক ক্ষমতা দান করা সত্ত্বেও আল্লাহ পাক কেন হযরত ঈসা (আঃ)-কে তৎকালীন সম্রাট তোতিয়ানূসের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর নির্দেশ না দিয়ে তাকে আসমানে উঠিয়ে নিলেন? আমাদের নবীকেই বা কেন মক্কার গুটিকয়েক কাফেরের মোকাবিলায় আল্লাহ পাক রাতের অন্ধকারে সুদূর মদীনায় হিজরতের নির্দেশ দিলেন?

বুঝা গেল আক্বীদা সংশোধনের মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজ গঠনই ছিল নবীদের সমস্ত দাওয়াত ও তাবলীগের মূল লক্ষ্য। আর এটা অত্যন্ত সহজ কথা যে, সমাজ বিপ্লবের আবশ্যিক পূর্বশর্ত হ’ল ব্যক্তির আক্বীদায় বিপ্লব আনা। আক্বীদায় পরিবর্তন এলে তার রাজনীতি-অর্থনীতি তথা কর্মজীবনের বিস্তীর্ণ পরিসরে পরিবর্তন আসা স্বাভাবিক। নবীগণ এই মৌলিক কাজটিই করে গিয়েছেন।

৬. এই দর্শনের অনুসারীরা তাঁদের মতের পক্ষে পবিত্র কুরআনের কয়েকটি অতি পরিচিত আয়াতকে প্রায়ই ব্যবহার করেন। যেমন- إِنِ الْحُكْــــمُ إِلا لِلّٰهِ 'নাই কারো হুকুম আল্লাহ ব্যতীত' (*ইউসুফ ১২/৪০*)।

وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُوْلٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ.... هُمُ الظَّـــالِمُوْنَ... هُمُ الْفَاسِقُوْنَ–

'যারা আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত হুকুম অনুযায়ী ফায়ছালা করে না, তারা কাফের,.. যালেম...ফাসেক' *(মায়েদাহ ৫/৪৪, ৪৫, ৪৭)*।

প্রথম আয়াতটি হযরত ইউসুফ (আঃ) তাঁর জেলখানার কয়েদী বন্ধুদেরকে যে দাওয়াত দিয়েছিলেন, তার বর্ণনা। তিনি পরে জেল হ'তে মুক্তি পেয়ে তৎকালীন মিসরের কুফরী হুকূমতের প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা 'আযীযে মিছরে'র অধীনে খাদ্যবিভাগের দায়িত্ব পালন করেছিলেন (যারা অনৈসলামী সরকারের অধীনে চাকুরী করা নাজায়েয বলতে চান, তারা বিষয়টি ভেবে দেখতে পারেন)। পরবর্তী সূরা মায়েদাহ্‌র আয়াতগুলি আহলে কিতাবগণকে তাওরাত ও ইঞ্জীলের বিধান অনুযায়ী বিচার-ফায়ছালা করার জন্য বলা হয়েছে।

এক্ষণে আয়াতগুলি যদি সাধারণ অর্থে নেওয়া হয়, তাহ'লে প্রথম আয়াতটি 'হুকমে তাকভীনী' বা প্রাকৃতিক বিধান অর্থে নিতে হবে, যার একচ্ছত্র মালিকানা আল্লাহ্‌র হাতে। এর অর্থ কখনোই রাষ্ট্রীয় বিধান নয়, যা পরিষ্কারভাবে 'হুকমে আক্বলীর' অন্তর্ভুক্ত। এটির অর্থ 'হুকমে শারঈ'ও নয়। তা যদি হ'ত তাহ'লে হযরত ইউসুফ (আঃ) নিজে নবী হয়ে এবং নিজে এই আয়াতের প্রবক্তা হয়ে তার বিরোধিতা করে কুফরী হুকূমতের অধীনে কোন দায়িত্ব পালন করতেন না। বরং হুকূমতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করতেন।

অতঃপর সূরা মায়েদাহ্‌র আয়াতগুলি ইসলামী রাষ্ট্রের আদালতের বিধান হিসাবে গণ্য হবে। যেন বিচারকগণ আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী

বিচার-ফায়ছালা করেন। অবশ্য যদি কোন বিষয়ে কুরআন ও হাদীছের স্পষ্ট দলীল না পাওয়া যায়, সে ক্ষেত্রে বিচারক ইজতেহাদের ভিত্তিতে রায় দিতে পারবেন।[৩০]

৭. অনৈসলামী হুকূমতের কোন আইন মানা চলবে না। এই ভুল চিন্তা-ধারার প্রসার ঘটার ফলে এদেশের তরুণ সমাজ যেমন সরকার বিরোধিতাকেই বড় জিহাদ ভাবতে শুরু করেছে, ভারতীয় মুসলিমদের একাংশ তেমনি সে দেশের বিভিন্ন সরকারী পদ ও দায়িত্ব হ'তে চলে আসার ফলে সেখানে সংখ্যালঘু মুসলমানদের অবস্থা ক্রমেই করুণ হ'তে করুণতর হ'তে চলেছে।[৩১]

৮. আল্লাহ্‌র হুকুম ও সরকারের হুকুমকে এক করে দেখার এই দর্শনটি কোন নতুন আবিষ্কার নয়। ইসলামের প্রথম যুগে চতুর্থ খলীফার আমলে সৃষ্ট খারেজী ফিতনার মূল শ্লোগান ছিল এটা। ঐতিহাসিক ছিফ্‌ফীন যুদ্ধের শেষে হযরত আলী (রাঃ) ও মু'আবিয়া (রাঃ)-এর মধ্যকার শালিশী বৈঠকের ব্যাপারে অসন্তুষ্ট ও হযরত আলীর (রাঃ) দলত্যাগী আট হাযার

---

৩০. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) সূরা মায়েদাহ ৪৪ আয়াতের فَأُوْلٰئِكَ هُـــمُ الْكَافِرُوْنَ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, ليس بالكفر الذى يذهبون اليــه 'এর অর্থ কুফরী নয়, যেদিকে লোকেরা গিয়েছে' *(হাকেম ২/৩১৩ পৃঃ হাদীছ ছহীহ)*। ত্বাঊস বলেন, ليس بكفر ينقل عـــن الملـــة 'এর অর্থ ঐ কুফরী নয় যা তাকে ইসলামী মিল্লাত থেকে খারিজ করে দেয়'। আত্বা বলেন, এটি কুফরীর পরেই সবচেয়ে বড় পাপ' *(তাফসীর ইবনু কাছীর)*। এক্ষণে আয়াতগুলির মর্ম হ'ল এই যে, যদি কোন মুসলিম বিচারক আল্লাহকৃত কোন হারাম কে হারাম বলে বিশ্বাস করেন, কিন্তু বাস্তবে উক্ত হারাম কর্ম সম্পাদন করেন, তাহ'লে তিনি ফাসেক ও পাপিষ্ঠ মুসলিম হিসাবে গণ্য হবেন। তার বিষয়টি আল্লাহ্‌র উপরে ছেড়ে দেওয়া হবে। চাইলে তিনি তাকে আযাব দিবেন, চাইলে ক্ষমা করবেন। কেননা কবীরা গুনাহগার মুসলিম 'কাফের' হয়না। তবে খারেজীদের মতে ঐ ব্যক্তি কাফের *(কুরতুবী)*। সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী এবং তার রক্ত হালাল। *[আলোচ্য তৃতীয় মতবাদটির অনুসারীগণ সূরা মায়েদাহ্‌র অত্র আয়াত তিনটিকে তাদের চরমপন্থী আন্দোলনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে থাকেন। যেটা স্রেফ অপব্যাখ্যা বৈ কিছুই নয়]*।

৩১. আল-হারাকাতুস্ সালাফিইয়াহ বে-কেরেলা, পৃঃ ১৮।

সৈন্য যারা ইতিহাসে 'খারেজী' বা দলত্যাগী নামে খ্যাত, তারাও হযরত আলী (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে لاَ حُكْـــمُ إِلاَّ لِلّٰهِ 'নাই কারও শাসন আল্লাহ ছাড়া' এই শ্লোগান তুলেছিল। হযরত আলী (রাঃ) তাদের জওয়াবে বলেছিলেন,

كلمة عادلة يراد بها جور، إنما يقولون أَلاَّ إمارةَ، ولا بُدَّ من إمارةٍ بــــرةً او فاجرةً-

'কথা ঠিক কিন্তু বাতিল অর্থ নেওয়া হয়েছে। এরা বলতে চায় যে, (আল্লাহ ছাড়া কারও) শাসন নেই। অথচ অবশ্যই শাসন ক্ষমতায় ভাল ও মন্দ সব ধরনের লোকই আসতে পারে'।[৩২]

হযরত আলী (রাঃ), হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) ও দু'পক্ষের মধ্যস্থতাকারী হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) ও হযরত আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ) প্রত্যেকেই ছিলেন অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদার ছাহাবী। তাঁরা অবশ্যই সূরা ইউসুফের উক্ত আয়াতের মর্ম বুঝতেন। তাঁরা হুকূমত পরিচালনাকে হুকমে শারঈ বা ইবাদতের পর্যায়ে ফেলেননি। বরং এটাকে হুকমে আক্বলী বা বৈষয়িক ব্যাপার বলে গণ্য করেছিলেন। যতক্ষণ না সেটা শরী'আতের কোন হুকুমকে অর্থাৎ হুকমে শারী'আকে লংঘন করে। এই পার্থক্য না বুঝার ফলে কলেজ-মাদ্রাসার বাচ্চা ছেলেরাও যখন এই সব মহান ব্যক্তিদের সমালোচনা করে, তখন সত্যিই দুঃখ হয়। এ বিষয়ের আলোচনা 'মধ্যপন্থা' অধ্যায়ে দেখুন।

এখানে একটি সর্বসম্মত মূলনীতি মনে রাখা প্রয়োজন যে, ইসলামী শরী'আতের অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের প্রদত্ত ও গৃহীত ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত। পরবর্তীকালে দেওয়া কারো কোন কপোলকল্পিত ব্যাখ্যা যদি ছাহাবায়ে কেরামের প্রদত্ত ব্যাখ্যার প্রতিকূলে হয়, তবে তা অবশ্যই পরিত্যাজ্য হবে।

৯. এই দর্শন ইসলামকে 'কুল দ্বীন' বা সর্বব্যাপী জীবন বিধান হিসাবে পেশ করেছে। বলা হয়েছে,

৩২. ইবনু কুতায়বা, আল-ইমামাতু ওয়াস সিয়াসাহ্ ১/১৫৬ পৃঃ।

یہ کوئی بنئے کی دکان کا سودا نہیں ھے کہ جو سودا چاھا اورجتنا چاھا لے لیا اور جو چاھا چھوڑ دیا- ایسا کرنا دین کے بعض حصہ پر إیمان لانا اور بعض کا کفر کرنا ھے- یاتو پورے کا پورا سودا لینا ھوگا یا سب کا سب چھوڑنا پڑیگا-

'ইসলাম কোন বণিকের দোকান নয় যে, ইচ্ছামত দোকানের কোন মাল কিনবে, কোন মাল ছাড়বে। এরূপ করা দ্বীনের কোন অংশের উপর ঈমান আনা ও কোন অংশের সঙ্গে কুফরী করার শামিল। হয় (ইসলাম রূপী দোকানের) সবকিছু খরিদ করতে হবে, নয় সবটুকুই ছাড়তে হবে।[৩৩]

কথাগুলি আপাত মধুর হ'লেও এর মধ্যে রয়েছে বিরাট শুভংকরের ফাঁকি। ভ্যারাইটি স্টোরে রকমারি জিনিষের বিরাট স্টক থাকতে পারে, তাই বলে একজন খরিদ্দারকে সবকিছুই একত্রে কিনতে হবে, এটা কেমন দাবী? ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এতে মানব জীবনের সকল সমস্যার সমাধান নিহিত আছে। একথা শতকরা একশত ভাগ সত্য। কিন্তু তাই বলে ইসলাম গ্রহণকারী একজন মুসলিমকে একই সাথে জীবনের সকল দিক ও বিভাগে বিচরণ করতে হবে এবং সবকিছুতেই সমান পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে এটা কেমন কথা? ইসলাম তো এ দাবী কোন মুসলমানের নিকট করেনি যে তাকে একই সঙ্গে ভাল আলেম, ভাল চাষী, ভাল শিল্পী, ভাল ব্যবসায়ী, ভাল ডাক্তার, ভাল রাজনীতিক, ভাল সমাজনেতা সবকিছুই হ'তে হবে। বরং এটাই স্বাভাবিক যে, একজন মানুষ কখনোই সকল কাজে পারদর্শী হ'তে পারে না। এমনকি একজন ভাল মুসলমান শত চেষ্টায় হয়তবা জীবনে যাকাত বা ওশর আদায়ের কিংবা হজ্জ করার মত বুনিয়াদী ফরয আদায়ের যোগ্যতাও অর্জন করতে পারেন না।

এক্ষণে একজন লোক স্বীয় অযোগ্যতা বা অন্য কোন কারণে রাজনীতি করেন না। কিন্তু ব্যক্তি জীবনে তিনি পূর্ণভাবে ইসলামী চরিত্রের অধিকারী। ইনি পূর্ণাঙ্গ মুসলিম হবেন কি? আধুনিক এই দর্শনের মতে ঐ ব্যক্তি আর যাই হোক পূর্ণাঙ্গ মুসলিম নন। কারণ ইসলামের মূল ইবাদতটিই তার

৩৩. হাকীম ওবায়দুল্লাহ খান, ইসলামী সিয়াসাত ইয়া সিয়াসী ইসলাম (শ্রীনগর, কাশ্মীর ১৯৭৮ খৃঃ) ২৩ পৃঃ।

জীবন থেকে বাদ পড়ে গেছে। তবে হাঁ ঐ ব্যক্তি আর কোন দিক দিয়ে তেমন যোগ্য না হ'লেও যদি রাজনীতিতে পারঙ্গম হন, তাহ'লে বোধ হয় এই দর্শনের অনুসারীদের মতে তিনি পূর্ণাঙ্গ মুমিন (?) হ'তে পারেন। কারণ রাজনীতির আলোকেই তাঁরা মুসলমানকে বিচার করেন। বিচার বুদ্ধির এই মাপকাঠির কারণেই বিগত যুগের বড় বড় মুজাদ্দিদগণ কেউই এঁদের দৃষ্টিতে পূর্ণাঙ্গ মুজাদ্দিদ হ'তে পারেননি। কেননা তাঁরা নিজ নিজ আমলের সরকারের বিরুদ্ধে এদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী কোন রাজনৈতিক সংগ্রামে অবতীর্ণ হননি কিংবা স্বাধীনভাবে কোন ইসলামী হুকূমত কায়েম করেননি।

কুল দ্বীন ও ইক্বামতে দ্বীন-এর ব্যাখ্যা:

কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী 'কুল দ্বীন' ও 'ইক্বামতে দ্বীন'-এর সঠিক ব্যাখ্যা এই হ'তে পারে যে, যিনি জীবনের যে শাখায় কাজ করবেন, তিনি সেই শাখায় দ্বীনের হেদায়াত মেনে চলবেন। যিনি ব্যবসায়ী হবেন তিনি স্বীয় ব্যবসা ক্ষেত্রে 'ইক্বামতে দ্বীন' করবেন। অর্থাৎ শরী'আতের সীমারেখার মধ্যে থেকে তিনি ব্যবসা করবেন। যিনি রাজনীতিক হবেন তিনি নিজে শরী'আতের বিধান মেনে রাজনীতি করবেন এবং রাষ্ট্রীয় আইনে শরী'আতের বিধান বলবৎ করার চেষ্টা করবেন। যিনি চাকুরী করবেন তিনিও সেখানে দ্বীনের হেদায়াত মেনে চলবেন। যিনি বিদ্বান হবেন, তিনি তাঁর বিদ্যাবুদ্ধিকে অন্যান্য মতাদর্শের উপরে ইসলামকে বিজয়ী করার পিছনে ব্যয় করবেন। মোটকথা আল্লাহ পাক দুনিয়ার এ সংসার আবাদ করার জন্য যাকে যে কাজের যোগ্য করে পাঠিয়েছেন, তিনি সে কাজে অবশ্যই সাধ্যপক্ষে আল্লাহ্র আইন মেনে চলবেন। একেই বলে 'ইক্বামতে দ্বীন' বা দ্বীন প্রতিষ্ঠা। আর এভাবেই অন্যান্য দ্বীনের উপরে ইসলাম বিজয়ী হ'তে পারে। অতঃপর মানব জীবনের আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক সকল ক্ষেত্রে অভ্রান্ত হেদায়াত মওজূদ থাকার কারণে ইসলাম অবশ্যই একটি 'কুল দ্বীন' বা পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান যা অন্যান্য ধর্মের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কেননা ইসলাম ব্যতীত কোন ধর্মই পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান নয়।

১০. হাদীছের প্রতি সন্দেহবাদ:

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রচারিত অতি যুক্তিবাদী এই দর্শনটি ইসলামী আইনের দ্বিতীয় উৎস হাদীছ শাস্ত্র সম্পর্কে সন্দেহবাদ আরোপ করেছে । এবং পরবর্তীকালে রচিত ভুল-শুদ্ধ পারস্পরিক ইখতেলাফে ভরা ফিক্বহ শাস্ত্রকে রাসূলুল্লাহ *(ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)*-এর হাদীছের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দিতে চেষ্টা করেছে। এমনকি আল্লাহ্র কিতাবের পরে দুনিয়ার বিশুদ্ধতম হাদীছ গ্রন্থ বুখারী শরীফ সম্পর্কে কথা বলতেও এই আধুনিক দর্শন মোটেই পিছপা হয়নি। যেমন বলা হয়েছে,

کوئی شریف آدمی یہ نہیں کہ سکتا کہ حدیث کا جو مجموعہ ہم تك پہونچا ہے وہ قطعی طور پر صحیح ہے- مثلاً بخاری جسکے بارے میں أصح الكتب بعد كتاب الله کہا جاتا ہے، حدیث میں کوئی بڑے سے بڑا غلو کرنیوالا بھی یہ نہیں کہ سکتا کہ اس میں جو چھ سات ہزار احادیث درج ہیں وہ ساری کی ساری صحیح ہے-

'কোন শরীফ লোক এ কথা বলতে পারে না যে, হাদীছের যে সমষ্টি আমাদের নিকট পৌঁছেছে তার সবটা অকাট্যভাবেই ছহীহ? উদাহরণ স্বরূপ বুখারী শরীফ, যাকে আল্লাহ্র কেতাবের পরে সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধতম কেতাব বলা হয়, হাদীছের অতি বড় ভক্তও এ কথা বলতে পারে না যে, এর মধ্যে যে ছয়-সাত হাযার হাদীছ সংকলিত আছে, তার সবটাই ছহীহ'।[৩৪] (নাঊযুবিল্লাহ)। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। কেবল ভারতগুরু শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ)-এর একটি উক্তি উপহার দিয়েই প্রসংগের ইতি টানতে চাই। তিনি বলেন,

---

৩৪. লাহোরের বরকত আলী হলের বক্তৃতা। লাহোর হ'তে প্রকাশিত উর্দূ সাপ্তাহিক আল-ই'তিছাম ২৭শে মে ও ৩রা জুন সংখ্যা ১৯৫৫-এর বরাতে আল্লামা দাউদ রায (মোমেনপুরা, বোম্বাই) প্রণীত 'তাহরীক' পৃঃ ৭০।

أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيها من المتصل المرفوع صحيح بالقطع وإنهما متواتران الى مصنفيهما وانه كل من يهوِّن أمرهما فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين–

‘ছহীহায়েন অর্থাৎ বুখারী ও মুসলিম সম্পর্কে হাদীছ বিশারদ পণ্ডিতগণ একমত হয়েছেন যে, এ দু’য়ের মধ্যে মুত্তাছিল মরফূ‘ যত হাদীছ রয়েছে, সবই অকাট্যভাবে ছহীহ। যে ব্যক্তি ঐ দুই গ্রন্থ সম্পর্কে হীন ধারণা পোষণ করবে সে বিদ‘আতী এবং মুসলিম উম্মাহ্র বিরোধী তরীকার অনুসারী’।[৩৫]

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, ১৯৩৪ সালের জুলাই সংখ্যা তারজুমানুল কুরআনে ‘মাসলাকে ই‘তিদাল’ নামে প্রকাশিত ও ১৯৭৯ সালের জানুয়ারীতে ‘তাফহীমাত’ ১ম খণ্ডে সংকলিত ৩৫০ হ’তে ৩৭০ পর্যন্ত ২১ পৃষ্ঠার বিরাট প্রবন্ধটি হাদীছ অস্বীকারকারীদের জন্য একটি বড় সান্ত্বনা বৈ-কি। প্রবন্ধটির বঙ্গানুবাদ ‘সুষম মতবাদ’ নামে ১৯৬০ সালে ঢাকা থেকে বের হয়েছে।

হাদীছ সম্পর্কে সন্দেহবাদ সৃষ্টি করলেও ফিক্বহ সম্পর্কে এই দর্শন তার অগাধ বিশ্বাস ব্যক্ত করেছে। যেমন বলা হয়েছে,

امام ابو حنيفة کی فقه ميں آپ بکثرت ايسے مسائل ديکھتے ہيں جو مرسل اور معضل اور منقطع احاديث پر مبنى ہيں، يا جن ميں ايک قوى الاسناد حديث کو چھوڑ کر ايك ضعيف الاسناد حديث کو قبول کيا گيا ہے، يا جن ميں احاديث کچھ کہتى ہيں اور امام ابو حنيفه اور انکے اصحاب کچھ کہتے ہيں– يہى حال امام مالك کا ہے- باوجوديکه اخبارى نقطۂ نظر ان پر زيادة غالب ہے، مگر پھر بھى انکے تفقه نے بہت سے مسائل ميں انکو ايسى احاديث کے خلاف فتوى دينے پر مجبور کر ديا جنہيں محدثين صحيح قرار ديتے ہيں- چنانچه ليث بن سعد نے انکى فقه سے تقريباً ۷۰ مسئلے اس نوعيت

৩৫. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, (মিসরঃ খায়রিয়া প্রেস ১৩২৩ হিঃ) ১/১০৬ পৃঃ ; ঐ (কায়রোঃ দারুত তুরাছ ১৩৫৫হিঃ/ ১৯৩৬ খৃঃ) ১/১৩৪ পৃঃ।

کے نکالے ہيں- امام شافعى کا حال بھى اس سے کچھ بہت مختلف نہيں-

অর্থঃ ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর ফিক্বহের মধ্যে আপনারা এমন বহু মাসআলা দেখবেন যা মুরসাল, মু‘যাল এবং মুনক্বাতে‘[৩৬] হাদীছ সমূহের উপর ভিত্তিশীল। অথবা উক্ত কোন মাস’আলা ছহীহ হাদীছ বাদ দিয়ে যঈফ হাদীছ গ্রহণ করা হয়েছে। কোন কোন মাসআলায় দেখা যাবে যে, হাদীছ সমূহ একরূপ বলছে, ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বা তাঁর শিষ্যমণ্ডলী অন্য রূপ বলছেন। একই অবস্থা ইমাম মালিক (রহঃ)-এর। তথ্য নির্ভরতার দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর মধ্যে জোরালো থাকা সত্ত্বেও ফিক্বহের বুঝ তাঁকে এমনামন হাদীছ সমূহের খেলাফ ফৎওয়া দিতে বাধ্য করেছে, যেগুলি মুহাদ্দিছগণ ছহীহ সাব্যস্ত করেছেন। লাইছ বিন সা‘দ নিজের ফেক্বহী বুঝ অনুযায়ী এই ধরনের প্রায় ৭০টি ফৎওয়া দিয়েছেন। ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর অবস্থাও এ থেকে ভিন্ন নয়’।[৩৭]

উপরোক্ত আলোচনার আগেই মাননীয় লেখক নিজের মন্তব্য পেশ করে বলেন,

جسطرح حديث کو بالکليه رد کر دينيوالا غلطى پر ہيں اسى طرح وه لوگ بھى غلطى سے محفوظ نہيں ہيں جنہوں نے حديث سے استفاده کرنے ميں صرف روايات ہى پر اعتماد کرليا ہے- مسلک حق ان دونوں کے درميان ہے – اور يه وهى مسلک ہے جو ائمۂ مجتہدين نے اختيار کيا ہے- *تفهيمات ج ۱ ص ۳٦٠ ط ۹۷۹ ام*-

অর্থাৎ হাদীছকে একেবারে অস্বীকারকারীরাও যেমন ভুলের উপরে আছে, অমনিভাবে ঐ লোকেরাও ভুল থেকে নিরাপদ নয়, যারা কেবল হাদীছের

৩৬.‘মুরসাল’ যার শেষ সনদে তাবেঈর উস্তাদের নাম বিচ্ছিন্ন। ‘মু‘যাল’ যার মধ্য সনদে পর পর দুই বা তদোধিক রাবীর নাম বিচ্ছিন্ন। ‘মুনক্বাতে‘ যার মধ্য সনদে এক বা একাধিক রাবীর নাম অসংলগ্নভাবে বিচ্ছিন্ন’। সকল হাদীছের হুকুম অগ্রাহ্য’। =আস্-সাহ্লুল মুসাহ্হাল ফী মুছত্বালাহিল হাদীছ (মদীনা) ১৮-১৯ পৃঃ ।

৩৭. তাফহীমাত (দিল্লী-৬ : মারকাযী মাকতাবা ইসলামী, ১৯৭৯) ১/৩৬০ পৃঃ ।

রেওয়ায়াত বা বর্ণনার উপরে ভরসা করেছেন। সঠিক রাস্তা ঐ দু'টির মাঝখানে আছে, যে পথ অনুসরণ করেছেন মুজতাহিদ ইমামগণ'।[৩৮]

কাদিয়ানী বিজয়ী শেরে পাঞ্জাব মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (১৮৬৮-১৯৪৮ খৃঃ) উপরোক্ত আলোচনার জওয়াবে বলেন, 'আসলে ইমাম আবূ হানীফা মুরসাল হাদীছকে যঈফ গণ্য করতেন না, যা সকলের বিরুদ্ধ মত। ইমাম মালেক ও শাফেঈ সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে, তা একেবারেই ভিত্তিহীন। তাঁরা জেনে-শুনে ছহীহ হাদীছের বিরুদ্ধে কোন ফৎওয়া দেননি। লাইছ বিন সা'দ সম্পর্কে ৭০টি ফৎওয়ার ব্যাপারে যে দাবী করা হয়েছে, সেটাও একেবারে ভিত্তিহীন। থাকলে দু'চারটে পেশ করা হউক'।[৩৯]

উপরের আলোচনায় হাদীছের বর্ণনার উপরে ভরসা না করে মুজতাহিদ ইমামগণের রায়কে যদি তা ছহীহ হাদীছ বিরোধীও হয়, তবুও তাকে সঠিক পথ বলা হয়েছে। অথচ মুজতাহিদগণের অবস্থা এই যে, তাঁদের পরস্পরের ইখতেলাফে ফিক্বহের কিতাবসমূহ ভরপুর। খোদ ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর সমস্ত ফৎওয়ার দুই তৃতীয়াংশের বিরোধিতা করেছেন তাঁর দুই প্রধান শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) ও ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ)। যেমন ইমাম গাযযালী (রহঃ) বলেন,

قال الامام الغزالى فى كتابه المنخول انهما خالفا ابا حنيفة فى ثلثى مذهبه–[৪০]

অমনিভাবে আল্লামা তাজুদ্দীন সুবকী বলেন যে, 'শুধু মাসায়েল বিষয়েই নয়, বরং ফেক্বহী মূলনীতিতেও উক্ত শিষ্যদ্বয় তাদের উস্তাদের বিরোধিতা করেছেন –(إنهما) يخالفان اصول صاحبهما'।[৪১]

---

৩৮. তাফহীমাত ১/৩৬০ পৃঃ।

৩৯. পাঞ্জাবের অমৃতসর হ'তে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'আখবারে আহলেহাদীছ' ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৫ হ'তে ৩০শে নভেম্বর '৪৫ পর্যন্ত ১১ কিস্তিতে সমাপ্ত বিরাট প্রবন্ধের সমষ্টি, 'খেতাব' ১৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৪০. আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী কৃত 'শরহ বেক্বায়াহ্র ভূমিকা' পৃঃ ৮ শেষ লাইন (দিল্লী ছাপা ১৩২৭ হিঃ); ঐ, (দেউবন্দ, মাকতাবা থানবী, তাবি) পৃ: ঐ।

৪১. তাক্বীউদ্দীন সুবকী, তাবাক্বাতুশ শাফেঈয়াহ কুবরা (বৈরুতঃ দারুল মা'রিফাহ, তাবি), ১/২৪৩ পৃঃ।

এবারে আসুন স্বয়ং ইমাম ছাহেবের কথা শুনি। তিনি স্বীয় প্রধান শিষ্য আবু ইউসুফকে বলেন, لا ترو عنى شيئا فإنى والله ما أدرى مخطئ أنا أما مصيب؟ 'তুমি আমার পক্ষ হ'তে কোন মাসআলা বর্ণনা করো না। আল্লাহ্র কসম আমি জানি না আমি নিজ সিদ্ধান্তে বেঠিক না সঠিক'।[৪২] তিনি আরও বলেন,

ويك يا يعقوب لا تكتب كل ما تسمعه منى فانى قد ارى الرأى اليوم واتركه غدا و ارى الرأى غدا وأتركه بعد غد رواه الخطيب باسناد متصل–

'সাবধান হে ইয়াকুব (আবু ইউসুফ)! আমার নিকট থেকে যা-ই শুনো তাই-ই লিখে নিয়ো না। কেননা আমি আজ যে রায় দেই, কাল তা পরিত্যাগ করি। কাল যে রায় দেই পরশু তা প্রত্যাহার করি।' ইমাম খতীব বাগদাদী অবিচ্ছিন্ন সনদে একথা রেওয়ায়াত করেছেন।[৪৩] বরং ইমাম আবু হানীফা সহ প্রসিদ্ধ চার ইমামের প্রত্যেকেই বলেছেন, إذا صح الحديث فهو مذهبنا 'যখন হাদীছ ছহীহ পাবে, জেনো সেটাই আমাদের মাযহাব'।[৪৪]

যারা হাদীছের প্রতি সন্দেহ পোষণ করে ফক্বীহ ও মুজতাহিদগণের রায়ের উপর নির্ভরশীল হতে চান, তাদের জন্য উপরোক্ত আলোচনাটিই যথেষ্ট বলে মনে করি। তবুও এখানে হযরত আলী (রাঃ)-এর একটি উক্তি উপহার দিতে চাই। তিনি বলেন, لو كان الدينُ بالرأى لكان أسفلُ الْخُفِّ أَوْلَى بالمسح من أعلاهُ– 'যদি দ্বীন রায় অনুযায়ী হ'ত তাহ'লে মোযার নীচের অংশ মাসাহ করা অধিক উত্তম হ'ত উপরের অংশের চেয়ে'।[৪৫]

পরিশেষে ঐ সকল ভাইদেরকে নিম্নের কয়েকটি আয়াতের দিকে নযর দিতে বলি।-

---

৪২. খতীব বাগদাদী, 'তারীখু বাগদাদ' (মিসরঃ সা'আদাহ প্রেস ১৩৪৯/১৯৩১ খৃঃ) ১৩শ খণ্ড ৪০২ পৃঃ ১১শ লাইন।

৪৩. তারীখু বাগদাদ ১৩শ খণ্ড ৪০২ পৃঃ ৮ম লাইন।

৪৪. শা'রানী, কিতাবুল মীযান, ১/৭৩ পৃঃ।

৪৫. হুজ্জাতুল্লাহ ১/১৫০ পৃঃ ; আবুদাঊদ; সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৫২৫ 'পবিত্রতা' অধ্যায় 'মোযার উপর মাসাহ' অনুচ্ছেদ।

(১) সূরা হিজ্‌র ৯ম আয়াত, যেখানে আল্লাহ পাক বলছেন, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ– 'নিশ্চয়ই আমরা উপদেশ (কুরআন) নাযিল করেছি এবং আমরাই এর হেফাযত করব'।

(২) إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيْزٌ، لاَ يَأْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ– 'নিশ্চয়ই যারা উপদেশ (কুরআন) আসার পর তা অস্বীকার করে, (তারা কঠিন শাস্তিপ্রাপ্ত হবে)। বস্তুতঃ এটি অবশ্যই একটি মহিমময় গ্রন্থ'। 'এতে বাতিলের কোন প্রবেশাধিকার নেই, না সম্মুখ থেকে না পিছন থেকে। এটি প্রজ্ঞাময় ও প্রশংসিত সত্তার (আল্লাহ্‌র) পক্ষ হ'তে অবতীর্ণ' (*হা-মীম সাজদাহ ৪১/৪১-৪২*)। অর্থাৎ সম্মুখ থেকে কাফের-মুশরিকরা এবং পিছন থেকে ফাসিক-মুনাফিকরা এর শব্দে বা অর্থে বাতিল কিছু ঢুকাতে পারবে না বা কোনরূপ পরিবর্তন করতে পারবে না।

(৩) রাসূলুল্লাহ*(ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)* কুরআন মুখস্থ করতে যখন ব্যস্ততা দেখাচ্ছিলেন, তখন নাযিল হ'ল, لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ– 'তাড়াতাড়ি 'অহি' আয়ত্ত করার তাগিদে আপনি জিহ্বা সঞ্চালন করবেন না'। 'নিশ্চয়ই অহি সংরক্ষণ ও তা পড়ানোর দায়িত্ব আমাদের'। 'যখন (জিব্রীলের মাধ্যমে) আমরা কুরআন পড়াব, তখন আপনি তার পিছে পিছে পড়ে যাবেন মাত্র'। 'অতঃপর ওটাকে (আপনার কথা, কর্ম ও সম্মতির মাধ্যমে) ব্যাখ্যা করার দায়িত্বও আমাদের' (*ক্বিয়ামাহ ৭৫/১৬-১৯*)।

অতঃপর নবী (ছাঃ)-এর দ্বীন সংক্রান্ত সকল কথাই যে আল্লাহ্‌র 'অহি' নিম্নের আয়াতটি তার বাস্তব সাক্ষী। যেমন (৪) আল্লাহ বলেন, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ، إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُّوْحَى– 'তিনি নিজের ইচ্ছামত (দ্বীনের

ব্যাপারে) কোন কথা বলেন না। যা কিছু বলেন, আল্লাহ্‌র অহি মোতাবেক বলেন' (*নাজম ৫৩/৩-৪*)।[৪৬]

উপরে বর্ণিত আয়াতগুলি একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, পবিত্র কুরআন ও হাদীছ সংরক্ষণের দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র উপরে। তিনি তাঁর নির্বাচিত বান্দাদের মাধ্যমে অভ্রান্ত সত্যের এ দুই উৎসের হেফাযত করেছেন। ইসলামের প্রথম যুগের ইতিহাস এর জাজ্বল্যমান সাক্ষী। ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যারা কুরআনের হাফেয ছিলেন, একটি হরফও তাদের স্মৃতিতে হেরফের হয়নি। পরবর্তীকালে হাদীছের হাফেযগণ যে অনুপম স্মৃতিশক্তির আধার ছিলেন, তা ছিল সর্বকালের ইতিহাসে বিস্ময়কর। যেখানে আধুনিক বিজ্ঞান বলছে তিন লক্ষ শব্দের বেশী স্মৃতিতে ধারণ করা মানুষের ক্ষমতার বাইরে।[৪৭] সেখানে রাবীদের নাম, সনদ ও হাদীছের মূল বর্ণনা সহ ছয় লক্ষ, সাত লক্ষ এমনকি দশ লক্ষ হাদীছের সনদ ও মতন হুবহু মুখস্থ রাখা অলৌকিক ব্যাপার ছাড়া আর কি হতে পারে? ইমাম আহমাদ, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম প্রমুখ মুহাদ্দেছীনের চেয়ে স্মৃতিধর কোন পুরুষ তাঁদের আগেও ছিলেন না, এযাবত হয়নি। আর পরে যদি কোন কালে হয়ও, তবুও তাকে দিয়ে তো আর হাদীছের হিফ্‌য বা যাচাই-বাছাইয়ের খিদমত হবে না।

এ কথা বলা হয়তবা অযৌক্তিক হবে না, যাঁরা হাদীছের উপর সন্দেহারোপ করেন, তাঁরা প্রকারান্তরে কুরআনের উপরেও সন্দেহ আরোপ করেন।

---

৪৬. হাদীছ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সরাসরি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে। কখনো জিব্রীল নিজে এসে শিক্ষা দিয়েছেন যেমন (ক) কা'বা চত্বরে রাসূলকে দু'দিন ছালাতের প্রশিক্ষণ দেওয়া (*আবুদাঊদ, তিরমিযী, মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত, হা/৫৮৩-৮৪ 'ছালাতের ওয়াক্ত সমূহ' অনুচ্ছেদ*)। (খ) ছাহাবীগণের মজলিসে এসে মানুষের বেশ ধরে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে দ্বীন শিক্ষা দেওয়া (*মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২*)। (গ) ভূপৃষ্ঠে কোন্ ভূখণ্ড উত্তম এরূপ এক প্রশ্নের উত্তর সরাসরি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এনে রাসূলকে জানিয়ে দেওয়া (*আহমাদ, হাকেম, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৭৪১ 'ছালাত' অধ্যায় 'মসজিদ ও ছালাতের স্থানসমূহ' অনুচ্ছেদ*) ইত্যাদি। এধরনের অসংখ্য নযীর রয়েছে।

৪৭. নয়াদিল্লী-২৫ হ'তে প্রকাশিত উর্দু মাসিক 'আত-তাও'ইয়াহ' আগষ্ট-সেপ্টেম্বর সংখ্যা ১৯৮৬, পৃঃ ২৭।

কেননা কুরআন যাঁরা হিফ্য করেছিলেন, হাদীছও তাঁরাই হিফ্য করেছেন। একই ছাহাবায়ে কেরামের মাধ্যমে আমরা অহিয়ে মাত্লু (কুরআন) ও অহিয়ে গায়র মাত্লু (হাদীছ) লাভ করেছি। এমতাবস্থায় চৌদ্দশ' বছর পরে এসে হাদীছের উপরে সন্দেহবাদ আরোপকারী পণ্ডিতদেরকে করুণা করা ভিন্ন আমাদের মত সাধারণ মুসলমানদের আর কি-ইবা করার থাকে? ট্রাজেডী এই যে, যাঁরা সুন্নাহ্তে সন্দেহ করেন, তাঁরাই আবার দেশে কুরআন ও সুন্নাহ্র আইন চালু করার জন্য দিন রাত গলদঘর্ম হচ্ছেন। আমরা এই সকল যুক্তিবাদীদের নিকট হক ও বাতিলের পার্থক্যকারী ফারূকে আযম হযরত ওমর (রাঃ)-এর একটি দ্ব্যর্থহীন উক্তি পেশ করে ক্ষান্ত হ'তে চাই। তিনি বলেন,

والذى نفسُ عُمَرَ بيده ما قبَضَ اللّٰهُ روحَ نبيهِ صلى الله عليه وسلم ولا رفَعَ الوحىَ عنه حتى أغنىَ امتَه كلَّهم عن الرأى–

'যার হাতে ওমরের জীবন তাঁর কসম খেয়ে বলছি, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর নবীর রূহ কবয করেননি এবং অহি উঠিয়ে নেননি, যতক্ষণ না তাঁর উম্মত সকল প্রকার যুক্তিবাদ হ'তে মুক্ত হ'তে পেরেছে'।[৪৮]

১১. অন্ধ অহমিকাবোধঃ

এই দর্শন মুসলিম উম্মাহকে বিভক্ত করে ফেলেছে এবং এর অনুসারীদের মধ্যে এক অন্ধ অহমিকাবোধের জন্ম দিয়েছে। এই দর্শন চৌদ্দশ' বছর পরে এসে নিজেকে ইসলামের প্রকৃত ভাষ্যকার গণ্য করেছে এবং যারা এর অনুসারী হবে না তাদেরকে 'ইহুদী' হবার দুর্ভাগ্য বরণ করতে হবে বলে ধমকি দিয়েছে। যেমন বলা হয়েছে-

اس قسم كى ايك دعوت كا جيسى كه همارى يه دعوت هے كسى مسلمان قوم كے اندر اٹهنا اس كو ايك بڑى سخت ازمائش ميں ڈال ديناهے ...ياتو اس كا ساتهـ دے اور اس خدمت كو انجام دينے كيلئے اٹه كهڑى هو جو امت مسلمه كى پيدائش كى ايك هى غرض هے، يا

৪৮. শা'রানী, কিতাবুল মীযান, ১/৬২ পৃঃ ১৮শ লাইন।

نهين تو اسے رد كر كے وهى پوزيشن اختيار كرلے جو اس سے پهلے يهودى قوم اختيار كر چكى هے- ايسى صورت ميں ان دو راهوں كے سوا كسى تيسرى راه كى گنجائش اس قوم كيلئے باقى نهى رهتى-

'এই ধরনের একটি দাওয়াত যেমন আমাদের এই দাওয়াত, যখন কোন মুসলিম কওমের নিকট পেশ করা হয়, তখন তাদেরকে তা একটি কঠিন পরীক্ষায় ফেলে দেয়। ... হয় এর সঙ্গে যোগ দিয়ে এর খিদমতে নিজেদেরকে নিয়োজিত করবে, যে জন্যে মুসলিম উম্মাহ্কে সৃষ্টি করা হয়েছে, নতুবা দাওয়াত প্রত্যাখান করে সেই অবস্থা এখতিয়ার করবে, যে অবস্থা অর্জন করেছিল (নবীর যুগে) ইহুদীগণ। এক্ষণে এই দু'টি পথ ব্যতীত মুসলিম উম্মাহ্র জন্য অন্য কোন পথ আর খোলা থাকে না'।[৪৯]

সকলেই জানেন যে, ইরানের বাহাঈ ফের্কার প্রতিষ্ঠাতা বাহাউল্লাহ ঈরানী এবং পাঞ্জাবের কাদিয়ানী ফের্কার প্রতিষ্ঠাতা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীও এক সময় মুসলিম উম্মাহ্কে এই ধরনের ধমকি শুনিয়েছিলেন। এখন পাক-ভারত উপমহাদেশের মুসলমানদের উপর এই ধমকি নাযিল হয়েছে। জানি না তারা তা কবুল করে এই দর্শনের অনুসারী দলটির নিকট থেকে পূর্ণাঙ্গ মুমিন হবার সার্টিফিকেট নিবেন, নাকি কবুল না করে ইহুদী হবার অভিশাপ কুড়াবেন?[৫০]

১২. ইবাদত ও ইত্বা'আতঃ

ইবাদত ও ইত্বা'আত তথা উপাসনা ও আনুগত্য সম্পর্কে এই দর্শন আর এক অভিনব ব্যাখ্যা পেশ করেছে। এই দর্শন আল্লাহ্র ইবাদত ও

৪৯. রোয়েদাদ (দিল্লী-৬; মারকাযী মাকতাবা ইসলামী, ৩য় সংস্করণ ১৯৮৩) ২য় খণ্ড ১৯ পৃঃ।

৫০. নভেম্বর '৮৫তে উক্ত দর্শনের অনুসারী রাবি-র পদার্থ বিদ্যার জনৈক ছাত্র (বর্তমানে একটি কলেজের শিক্ষক) দীন লেখককে লেখা এক পত্রে অত্যন্ত দরদের সঙ্গে বলেছিলেন 'দো'আ করি মৃত্যুর পূর্বে আপনি মুসলিম হয়ে মরুন।'

সরকারের আনুগত্যকে এক করে দেখেছে। বরং এর মতে রাষ্ট্রক্ষমতা অর্জনই হ'ল মূল ইবাদত। আর সেই ইবাদতের লক্ষ্যেই সকল কাজ করতে হবে। নইলে সব কিছুই ব্যর্থ হবে। যেমন বলা হচ্ছে,

یہ جملہ عبادات جو صرف ذرائع کی حیثیت میں ہیں گر اصول قیام حکومت کے واحد نصب العین سے علیحدہ ہو کر کام کرتے ہیں تو عند اللہ ان کا کوئی اجر نہ ہوگا-

'এই সকল ইবাদত যা কেবল মাধ্যম হিসাবে গণ্য হ'তে পারে, যদি হুকূমত কায়েমের মূল লক্ষ্য হ'তে বিচ্যুত হয়, তাহ'লে আল্লাহ্‌র নিকট এ সবের কোন ছওয়াব মিলবে না'।[৫১]

বক্তব্য খুবই পরিষ্কার। যদি আপনার ছালাত-ছিয়ামের পিছনে বঙ্গভবন দখলের পরিকল্পনা না থাকে, তাহ'লে ঐ ছালাত-ছিয়ামে কোন ছওয়াব নেই। এ কারণেই তো এই দর্শনের অনুসারীগণ সুন্নাত-বিদ'আত এমনকি শিরকের প্রসঙ্গ উঠলেও বলতে চান এসব ছোট-খাট ব্যাপার, মূল কথা হ'ল আপনি ইক্বামতে দ্বীনের (?) জন্য কি করছেন বা কত টাকা আমাদের ফাণ্ডে এয়ানত দিচ্ছেন সেটা বলুন। যেহেতু তাদের ধারণায় রাষ্ট্র ক্ষমতা অর্জনই হ'ল মূল ইবাদত। বাকী সবই এর ট্রেনিং কোর্স মাত্র। তাই যেনতেন প্রকারেণ ক্ষমতায় যাওয়াই করাই এদের প্রধান লক্ষ্য হ'য়ে দাঁড়ায়।

এই ধারণার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হয়েছে এই যে, যে সকল আলেম ও বিদ্বান রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডে জড়িত নন, বরং ওসব হ'তে দূরে থেকে দারস-তাদরীস, ইবাদত বা অন্যান্য ধর্মীয় খিদমতে রত আছেন, তাঁরা এদের ধারণা মতে ইক্বামতে দ্বীনের কাজ করছেন না (?) বলে এই দর্শনের অনুসারী লোকদের নিন্দাবাদের শিকার হচ্ছেন। এমনকি মতবিরোধের কারণে কোন কোন ক্ষেত্রে হত্যাযোগ্য অপরাধী হিসাবেও বিবেচিত হচ্ছেন। এদের সশস্ত্র ক্যাডারদের হাতে ইতিমধ্যে বেশ কিছু জীবনও গিয়েছে।

---

৫১. তাজদীদ ২৪ পৃঃ ও রোয়েদাদ ৩য় খণ্ড ৩২ পৃঃ -এর বরাতে 'ইসতিফসার' শ্রীনগর (কাশ্মীর) ৮ পৃঃ ৩য় লাইন।

ইবাদত ও ইত্বা'আত-এর পার্থক্য:

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) ইবাদতের ব্যাখ্যায় বলেন, العبادة هى غاية المحبة مع غاية الذل– অর্থাৎ 'চরম ভক্তি চরম বিনয়ের মাধ্যমে প্রকাশ করাকে ইবাদত বলা হয়'। আর ইত্বা'আত অর্থ আনুগত্য। ইত্বা'আত ও ইবাদত-এর মধ্যে আম-খাছ সম্পর্ক। ইত্বা'আত বা আনুগত্য 'আম বা সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়, যা আল্লাহ ও বান্দা সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু ইবাদত বা উপাসনা কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য নির্দিষ্ট। সূরা মু'মিনূন ৪৭ আয়াতে হযরত মূসা ও হারূণ সম্পর্কে ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গ যে وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُوْنَ (তাদের কওম আমাদের দাসত্বকারী) বলা হয়েছে, সেখানে 'ইবাদত' মূল (হাক্বীক্বী) অর্থে ব্যবহৃত হয়নি, বরং ভাবার্থে (মাজাযী) ব্যবহৃত হয়েছে। হাদীছে ইহুদী-নাছারাদের তাদের পীর-পুরোহিতদের প্রতি অন্ধ তাক্বলীদ সম্পর্কে বলতে গিয়ে تلك عبادتهم (ওটাই তাদের ইবাদত হ'ল) বলে যা বলা হয়েছে, সেটাও ভাবার্থে। নইলে মানুষ যে কখনও আল্লাহ্‌র আসনে বসতে পারে না, সে কথা সবাই বলবেন। এক্ষণে পিতার আনুগত্য, নেতার আনুগত্য, শিক্ষকের আনুগত্য, সরকারের আনুগত্য, সব কিছুকে যদি আল্লাহ্‌র আনুগত্য বা ইবাদতের সঙ্গে এক করে দেখা হয়, তাহ'লে তো পরোক্ষভাবে আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য সকলকেও মা'বূদের আসনে বসানো হয়। যেমন বলা হয়েছে,

پرستش در اصل بندگی کی فرع ہے اور اپنی عین فطرت کے اقتضاء سے اپنی اصل کے ساتھ رہنا چاہتی ہے- جب انسان اپنی جھل اور بے خبری کی بنا پر فرع کو اصل سے جدا کرتا ہے- بندگی ایك کی کرتا ہے اور پرستش دوسری کی- تو یہ تفریق سراسر فطرت کے خلاف واقع ہوتی ہے-

উপাসনা বা ইবাদত আসলে আনুগত্য বা ইত্বা'আতের শাখা মাত্র যা স্বাভাবিক তাকীদেই তার মূলের সঙ্গে মিলে থাকতে চায়। মানুষ যখন স্বীয় মূর্খতা ও উদাসীনতার কারণে শাখাকে মূল হ'তে পৃথক করে ফেলে- আনুগত্য একজনের করে, উপাসনা অন্যের করে, তখন এই পৃথকীকরণ

সম্পূর্ণ স্বভাব বিরুদ্ধ প্রমাণিত হয়'।[৫২] মোটকথা উপাসনা ও আনুগত্য একই সত্তার নিকট নিবেদন করতে হবে।

উপরোক্ত ব্যাখ্যা গ্রহণের ফলে যে কোন গুনাহ্‌গার ব্যক্তিকে কাফির বা মুশরিক বলতে হয়। কেননা ঐ ব্যক্তি নিশ্চয়ই নিজের নফসের হুকুমে বা অন্য কারও হুকুমে গুনাহ করেছে। এতে করে সাময়িকভাবে হ'লেও সে ঐগুলিকে মা'বূদের আসনে বসিয়েছে এবং তার ইবাদত করায় মুশরিক গণ্য হয়েছে। খারেজীদের মতে গুনাহে কবীরায় লিপ্ত ব্যক্তি তওবা না করে মরলে কাফির ও চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে।

রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এই ব্যাখ্যার ফল দাঁড়াবে এই যে, ধর্মনিরপেক্ষ কোন শাসক বা সরকারের আনুগত্য নিষিদ্ধ গণ্য হবে। কেননা ঐ শাসক বা সরকার যদি মুসলিমও হয়, তথাপি তার রাজনৈতিক আনুগত্য যেহেতু আল্লাহ্‌র নিকটে থাকে না, সেহেতু ঐ সরকার মুশরিক গণ্য হবে। আর মুশরিক সরকারের আনুগত্য করলে যেহেতু তাকে অন্যতম মা'বূদ-এর আসনে বসানো হবে, সেহেতু ঐ মা'বূদকে উৎখাত করাই তখন মুমিন প্রজা সাধারণের সর্বাপেক্ষা বড় জিহাদ হিসাবে পরিগণিত হবে। ফলে সরকার ও জনগণের মধ্যে গৃহযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে, যা রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেবে। ইসলাম নিশ্চয়ই তা চায় না।

পক্ষান্তরে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে সেই ইসলামী সরকারের বিরোধিতা করাও আরেক ধরনের শিরক হিসাবে গণ্য হবে। কেননা ইবাদত ও ইত্বা'আত যখন একই অর্থে ব্যবহৃত হবে, তখন ইসলামী সরকারের আনুগত্য আল্লাহ্‌র আনুগত্য হিসাবে বিবেচিত হবে। ইসলামের নামে ইসলামী সরকারের যে কোন কাজই নির্বিবাদে মেনে নিতে হবে। টুঁ শব্দটি করলেই আনুগত্যহীনতার দায়ে কাফির বা মুশরিক সাব্যস্ত হয়ে মৃত্যুদণ্ডের আসামীতে পরিণত হ'তে হবে। সেও অবশ্যম্ভাবীরূপে আরেক বিশৃংখলার জন্ম দিবে, যা কখনই ইসলামের কাম্য নয়। উমাইয়া, আব্বাসীয় ও তাদের পরবর্তী মুসলিম শাসকদের সময়ে হকপন্থী ওলামায়ে কেরামের উপরে নির্মম সরকারী নির্যাতন সমূহ আমাদেরকে বারবার উক্ত

---

৫২. তাফহীমাত, ১/৬৩ পৃঃ।

কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এ ক্ষেত্রে আমরা যদি ইবাদতকে আল্লাহ্‌র জন্য এবং ইত্বা'আতকে অন্যের জন্য গণ্য করি, তাহ'লে সরকারকে কাফির-মুশরিক না বলেও আমরা তার সমালোচনা করতে পারি।[৫৩]

ইবাদত ও মু'আমালাত:

জ্বিন ও ইনসান সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ، مَا أُرِيْدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَّمَا أُرِيْدُ أَن يُّطْعِمُوْنِ، إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ–

'আমি জ্বিন ও ইনসানকে শুধুমাত্র আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি'। 'আমি তাদের থেকে কোন রূযি চাই না এবং আমি চাই না যে তারা আমাকে খাওয়াবে'। 'নিশ্চয় আল্লাহই রূযিদাতা এবং প্রবল পরাক্রমশালী' *(যারিয়াত ৫১/৫৬-৫৮)*।

উপরোক্ত আয়াতে মানুষের সকল কাজ দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। ইবাদত ও মু'আমালাত তথা দ্বীনী ও দুনিয়াবী, ধর্মীয় ও বৈষয়িক। দু'ধরনের কাজে দু'ধরনের মূলনীতি আছে। ইবাদত-এর মূলনীতি হ'ল 'তাওক্বীফী'। অর্থাৎ কেবলমাত্র শরী'আতই যে কোন ইবাদত চালু করতে পারে। নিজেরা ধর্মের নামে কোন অনুষ্ঠান চালু করলে সেটা বিদ'আত হবে, যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

পক্ষান্তরে মু'আমালাত বা বৈষয়িক কাজ-কর্মের মূলনীতি হ'ল 'ইবাহাত'। এখানে আমরা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারি, যতক্ষণ না সেটা শারঈ সীমারেখা অতিক্রম করে। যেমন যায়েদ তার দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় মাছ-গোশত-দুধ, ডিম রাখবে, না শাক-সবজী-ডাল রাখবে, সে বিষয়ে সে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিবে। সে খেয়াল রাখবে যেন হারাম খাদ্য ভক্ষণ না করে। অমনিভাবে দেশের শাসনকর্তা সার্বিক পরিস্থিতির বিবেচনায় কখন কোন আইন রচনা করা যায়, তিনি তার বিজ্ঞ পারিষদবর্গের সঙ্গে পরামর্শ

---

৫৩. দ্রঃ মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৭১ 'নেতৃত্ব ও বিচার' অধ্যায়, হাদীছ উম্মে সালামাহ (রাঃ) হ'তে।

করে তা করবেন। কিন্তু এমন আইন তিনি রচনা করতে পারবেন না, যা হারামকে হালাল করে বা হালালকে হারাম করে। অর্থাৎ কোন অবস্থাতেই শরী'আতের সীমা লংঘন করা চলবে না। বলা বাহুল্য বৈষয়িক ব্যাপারে দ্বীনের হেদায়াত মেনে চলার ফলে দুনিয়াবী ঐ কাজটিও দ্বীন ও ইবাদাতের মর্যাদা লাভ করতে পারে। কিন্তু আসলে দ্বীন দ্বীনই থাকে, দুনিয়া দুনিয়াই থাকে। যেমন জ্বলন্ত লোহাকে আমরা 'লোহাটি আগুন হয়ে গিয়েছে' বলি। কিন্তু আসলে লোহা লোহাই থাকে, আগুন আগুনই থাকে।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখের দাবী রাখে। সেটি হ'ল দুনিয়ার উদ্দেশ্যে দুনিয়া করলে তাতে কোন গুনাহ নেই। দ্বীন মেনে দুনিয়া করলে তাতে ছওয়াব আছে। পক্ষান্তরে দুনিয়া হাছিলের উদ্দেশ্যে দ্বীন করলে দ্বীন-দুনিয়া দু'টিই বরবাদ হবে। অন্যভাবে আমরা বলতে পারি, যে ব্যক্তি দুনিয়ার জন্য দুনিয়া করে, সে স্রেফ দুনিয়া পায়, কিন্তু আখেরাত হারায়। আর যে ব্যক্তি দ্বীনের জন্য দুনিয়া করে, সে দ্বীন-দুনিয়া দু'টিই পায়। কিন্তু যে ব্যক্তি দুনিয়ার জন্য দ্বীন করে, সে দ্বীন-দুনিয়া দু'টিই হারায়। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন।

কয়েকটি দলীল

সকল বিষয়ে শরী'আতের স্পষ্ট হেদায়াত মওজুদ থাকলেও মানবজীবনের একটি বিরাট অংশকে শরী'আতের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। যেখানে মানুষ নিজ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা মতে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। একেই দুনিয়াবী জীবন বলা হয়। যারা নাস্তিক তারা মানুষের ধর্মীয় জীবনকে অস্বীকার করে বলে, إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ, 'এই দুনিয়াবী জীবনের বাইরে কিছু নেই। এখানে আমরা মরি ও বাঁচি। আমাদের পুনরুত্থান হবে না' *(মুমিনূন ২৩/৩৭)*। পক্ষান্তরে আলোচ্য দর্শন এর উল্টো দুনিয়াবী জীবনকে অস্বীকার করে মানুষের সার্বিক জীবনকে ধর্মীয় জীবন গণ্য করেছে। অথচ ইসলামের নবী (ছাঃ) এর বিপরীত হেদায়াত দিয়েছেন। যেমন- (১) রাসূলুল্লাহ *(ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)* মদীনায় হিজরত করে দেখলেন যে, মদীনাবাসীগণ পুং খেজুরের ফুলের রেণু নিয়ে মাদী খেজুরের ফুলের সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। তাতে খেজুরের ফলন

ভাল হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই নিয়ম পসন্দ করলেন না। ফলে লোকেরা এটা বাদ দিল। দেখা গেল ফলন দারুণভাবে কম হ'ল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের বললেন,

إنما أنا بشرٌ إذا أمرتُكم بشىء من أمر دينكم فخُذُوا به وإذا أمرتُكم بشئ من رأيي فإنما أنا بشرٌ، رواه مسلم–

'নিশ্চয়ই আমি একজন মানুষ। যখন আমি তোমাদেরকে দ্বীনী বিষয়ে হুকুম দেব, তখন তোমরা সেটা অবশ্যই পালন করবে। কিন্তু যখন আমি আমার রায় অনুযায়ী কোন নির্দেশ দিব, তখন নিশ্চয়ই আমি একজন মানুষ মাত্র'।[৫৪]

(২) হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর মুক্ত দাসী বারীরাহ্ তার স্বামী মুগীছ থেকে মুক্ত হ'তে চায়। বেচারা মুগীছ মদীনার অলিতে-গলিতে বারীরাহ্কে ফিরে পাওয়ার জন্যে কেঁদে বুক ভাসায়। দয়ার নবী এই দৃশ্য দেখে অভিভূত হয়ে বারীরাহকে ডেকে বললেন, لو راجعته 'আহ্! যদি তুমি স্বামীর কাছে ফিরে যেতে'? বারীরাহ্ জওয়াবে বলল, হে রাসূল (ছাঃ)! أتأمرني 'আপনি কি আমাকে নির্দেশ দিচ্ছেন? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, إنما أشفَعُ 'না আমি মুগীছের জন্য তোমার নিকট সুফারিশ করছি মাত্র'। বারীরাহ্ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিল, لا حاجة لى فيه 'তার কাছে আমার কোন প্রয়োজন নেই'। বুঝা গেল নবীর উক্ত সুফারিশ রাসূল হিসাবে কোন দ্বীনী নির্দেশ ছিল না। নইলে তো বারীরাহকে অবশ্যই তা মেনে নিতে হ'ত। কিন্তু আসলে এ সুফারিশ ছিল একজন দরদী মানুষ হিসাবে, যা গ্রহণ করা না করার ব্যাপারে বারীরাহ্র স্বাধীনতা ছিল। প্রকাশ থাকে যে, বারীরাহ্র এই ঘটনাটি বুখারী শরীফে বিভিন্ন প্রসঙ্গে পঁচিশ জায়গায় এসেছে।[৫৫]

---

৫৪. মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৭ 'ঈমান' অধ্যায়, 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ।

৫৫. বুখারী হা/৫২৮৩ 'তালাক' অধ্যায় ১৬ অনুচ্ছেদ; হা/২৭২৬ 'শর্তসমূহ' অধ্যায় ১০ অনুচ্ছেদ ও অন্যান্য; মিশকাত হা/৩১৯৯, 'বিবাহ' অধ্যায় ৬ অনুচ্ছেদ।

(৩) বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামরিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) ছাহাবায়ে কেরামের নিকট পরামর্শ নিতেন। এই পরামর্শ পুরোপুরি সমতার ভিত্তিতে হ'ত। কখনো নিজের মতে, কখনও ছাহাবায়ে কেরামের মতের উপরে সিদ্ধান্ত হ'ত। একটি বর্ণনা অনুযায়ী মোট তেইশটি ঘটনায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চাইতে হযরত ওমরের রায় সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হ'ল বদরের যুদ্ধে বন্দী কাফিরদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যাপারে। হযরত ওমর (রাঃ) স্ব স্ব আত্মীয় কর্তৃক সকল শত্রুকে হত্যা করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু আবুবকর (রাঃ) তাদেরকে রক্তমূল্যের বিনিময়ে ছেড়ে দিতে বলেন। আল্লাহ্‌র নবী (ছাঃ) আবুবকরের পরামর্শ গ্রহণ করে সবাইকে রক্তমূল্যের বিনিময়ে মুক্ত করে দিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই আয়াত নাযিল করে আল্লাহ ওমরের রায়কেই সমর্থন করলেন।

হযরত ওমরের দৃষ্টিভঙ্গী এখানে পুরো রাজনৈতিক ছিল। তিনি শত্রুসৈন্যকে বন্দী না করে প্রথম সুযোগেই খতম করে দিতে চেয়েছিলেন। আল্লাহ সেটাই পসন্দ করেছিলেন। ফলে مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ অর্থ: 'দেশে ব্যাপকভাবে শত্রুকে পরাভূত না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা কোন নবীর জন্য সংগত নয়। তোমরা চাও পার্থিব সম্পদ, আল্লাহ চান পারলৌকিক কল্যাণ। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়' *(আনফাল ৮/৬৭)* আয়াতটি নাযিল হওয়ার সাথে সাথে আল্লাহ্‌র নবী ও হযরত আবুবকর কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন।

এ সকল ঘটনা একথাই প্রমাণ করে যে, মানুষ তার বৈষয়িক জীবনে নিজে সিদ্ধান্ত নিতে পারে, যতক্ষণ না সেখানে কোন শারঈ হুকুম মওজূদ থাকে। সে রাজনৈতিক ব্যাপারে যে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারে, যে কোন আইন রচনা করতে পারে। কিন্তু উদাহরণ স্বরূপ সার্বভৌম ক্ষমতা আল্লাহ্‌র বদলে জনগণকে কিংবা জনগণের নামে পার্টির বা সরকারের কুক্ষিগত করা চলবে না। সূদের হারামকে হালাল করে অর্থনৈতিক আইন চালু করতে পারবে না। জুয়া-লটারী-হাউজী-মওজূদদারী, মুনাফাখোরী, ঘুষখোরীর প্রচলন ঘটাতে পারবে না। কারণ তা করলে শরী'আতের সীমা লংঘন করা হবে।

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

ছিফ্ফীন যুদ্ধে মীমাংসার জন্য হযরত আলী ও মু'আবিয়া (রাঃ) উভয় পক্ষের দু'জনকে শালিশ নির্বাচন করেন। এই শালিশ নির্বাচনকে হযরত আলী (রাঃ)-এর সৈন্যদের একটি বিরাট অংশ 'কুফরী' ধারণা করে বসল। তারা আলী ও মু'আবিয়া উভয়কে কাফির (নাঊযুবিল্লাহ) গণ্য করে উভয়কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আলী (রাঃ) তখন বাধ্য হয়ে এই দলত্যাগী (খারেজীদের) বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন ও তাদের নির্মূল করে দেন। এই সময়কার ঘটনায় হযরত আলীর নিকট হ'তে অনুমতি নিয়ে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) খারেজীদের নিকট গমন করেন ও তাদের মনোভাব পরিবর্তনের শেষ চেষ্টা করেন। ইবনে আব্বাসের নিকট তখন খারেজীরা তিনটি অভিযোগ পেশ করে। -

১. আলী (রাঃ) কেন দ্বীনী ব্যাপারে মানুষকে শালিশ সাব্যস্ত করলেন? অথচ আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ 'আল্লাহ ছাড়া কারও হুকুম দেয়ার অধিকার নেই' *(ইউসুফ ১২/৪০)*।

২. তিনি প্রতিপক্ষকে গালিও দেন না, তাদের মাল-সম্পদও লুট করেন না। যদি মু'আবিয়ার দল কাফির হয়, তবে তাদের মাল হালাল। আর যদি মুমিন হয়, তবে তাদের রক্ত হারাম।

৩. শালিশনামা লেখার সময় আলীকে 'আমীরুল মুমিনীন' (মুমিনদের নেতা) লেখা হয়নি। তা হ'লে নিশ্চয়ই তিনি আমীরুল কাফেরীন (কাফিরদের নেতা) হবেন।'

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) যিনি অত্যন্ত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছাহাবী ছিলেন, সংক্ষেপে যুক্তিপূর্ণ ভাষায় উপরের প্রশ্নগুলির যে জওয়াব দিয়েছিলেন, তা আমাদের সবারই জন্য শিক্ষণীয় বিষয়। **উক্ত জওয়াবগুলি ছিল নিম্নরূপ :**

১. যদি কেউ ইহরাম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে কোন প্রাণী শিকার করে, তাহ'লে তাকে অনুরূপ একটি প্রাণী বদলা দিতে হবে। প্রাণীটি পূর্বের

প্রাণীর অনুরূপ কি-না, তা যাচাইয়ের জন্য দু'জন ন্যায়নিষ্ঠ লোককে মধ্যস্থ নিযুক্ত করতে হবে। এই মর্মে আল্লাহ বলেন, يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ *(মায়েদা ৫/৯৫)*। অমনিভাবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গণ্ডগোল হ'লে দু'পক্ষের দু'জনকে শালিশ নিয়োগের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন, وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا– *(নিসা ৪/৩৫)*।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) উপরোক্ত দু'টি আয়াতের বরাত দিয়ে খারেজীদেরকে আল্লাহ্র দোহাই দিয়ে বলেন, ইহরাম অবস্থায় শিকার করা খরগোশ যার মূল্য সিকি দিরহামও নয়, তার জন্য শালিশ নিয়োগ করার চাইতে মুসলমানদের জানমালের হেফাযতের জন্য একটি বৈষয়িক ব্যাপারে মীমাংসার উদ্দেশ্যে শালিশ নিয়োগ করা কি অধিকতর যুক্তি সংগত নয়? তারা বলল, হ্যাঁ।

২. তোমাদের দ্বিতীয় প্রশ্নের জওয়াব এই যে, তোমরা কি তাহ'লে মা আয়েশাকেও (যিনি হযরত আলীর বিরুদ্ধে 'জামাল যুদ্ধে' নেতৃত্ব দিয়েছিলেন) গালি দিবে? তাঁকেও কি কাফের বলবে? *(ইন্নালিল্লাহ)*। তারা ভুল স্বীকার করল।

৩. তোমরা কি হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে দেখোনি যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে 'রাসূলুল্লাহ' শব্দ কেটে দিয়ে সন্ধিপত্রে শুধুমাত্র 'মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ' লিখতে হযরত আলীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। খারেজীরা তাদের ভুল স্বীকার করল এবং বিশ হাযার লোক তওবা করে ফিরে এল। মাত্র চার হাযার রয়ে গেল। যারা যুদ্ধে হতাহত হ'ল।[৫৬]

উপরোক্ত ঘটনায় একথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, ছাহাবায়ে কেরাম রাজনৈতিক বিষয়কে ধর্মীয় গণ্ডির মধ্যে টেনে আনেননি। তাঁদের যা গণ্ডগোল রাজনৈতিক ও বৈষয়িক ব্যাপারেই ছিল, ধর্মীয় ব্যাপারে নয়। আর রাজনৈতিক বা বৈষয়িক ব্যাপারে মতবিরোধ এমনকি পারস্পরিক যুদ্ধ-

৫৬. মীর ইবরাহীম শিয়ালকোটি, তারীখে আহলেহাদীছ (নয়াদিল্লীঃ ১৯৮৩) পৃঃ ৪৬; গৃহীতঃ ফাওয়াতেহুর রাহমূত (গাযযালীর মুসতাছফা সহ) ২য় খণ্ড ৩৮৮ পৃঃ।

বিগ্রহের কারণে কেউ কাউকে 'কাফির' বলতেন না। মরলে 'শহীদ' বাঁচলে 'গাযী' হবার গৌরব করতেন না। সাবাঈ, শী'আ, খারেজী এই ধরনের কিছু লোক রাজনৈতিক বিষয়গুলিকে ধর্মীয় বিষয়ের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলে মুসলমানদের মধ্যে ফিৎনার সৃষ্টি করেছিল মাত্র। আজও কিছু লোক সে ফিৎনার মধ্যে রয়েছে।

এক নযরে তিনটি মতবাদ

(النظريات الثلاثة فى لمحة)

১ম মতবাদ : তাক্বলীদ (التقليد) : হিজরী চতুর্থ শতকে আবিষ্কৃত এই মতবাদটি ধর্মের নামে মানুষকে মানুষের গোলামে পরিণত করেছে। মুসলিম বিদ্বানদের জন্য ইজতিহাদের দরজা বন্ধ করেছে। মুসলিম উম্মাহকে বিভিন্ন বিদ্বানের নামে বিভিন্ন দল ও উপদলে (মাযহাব ও তরীক্বায়) বিভক্ত করেছে। মুসলমানদের কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক শক্তি বিনষ্ট করেছে। মুসলিম জনসাধারণকে নিঃশর্তভাবে কুরআন ও হাদীছের বিধান মানার বদলে নির্দিষ্ট মাযহাবী ফিক্বহের অনুসারী হ'তে বাধ্য করেছে। ফলে তাক্বলীদ বজায় রেখে কুরআন ও সুন্নাহ্র নিরপেক্ষ অনুসরণ যেমন অসম্ভব হয়েছে, নির্ভেজাল ইসলামী সমাজ কায়েম করাও তেমনি নিছক কল্পনা বিলাসে পরিণত হয়েছে।

২য় মতবাদঃ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ (فصل الدين عن السياسة) **:** এই মতবাদ দ্বীনকে দুনিয়াবী জীবন থেকে পৃথক করতে চেয়েছে এবং মানুষের বৈষয়িক ব্যাপারে ইসলামের কোন হেদায়াত নেই বলে বিশ্বাস করেছে, যা প্রকৃত অবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত। এই মতবাদে বিশ্বাসী হওয়ার ফলে ব্যক্তি জীবনে একজন সৎ ও দ্বীনদার মুসলমানও নিজেকে বা নিজের দেশকে পরিচালনার জন্য হাসিমুখে ইসলাম বিরোধী মতবাদসমূহ কবুল করে নেয়। এইভাবে নিজের অজান্তেই সে বিদেশীদের কলুর বলদে পরিণত হয়।

৩য় মতবাদ রাজনীতিই ধর্ম (والسياسة هي الدين) **:** এই মতবাদ মানুষের পুরো যিন্দেগীকে দ্বীনী যিন্দেগী গণ্য করেছে। এই মতবাদ দুনিয়া হাছিলের

মাধ্যম হিসাবে দ্বীনকে ব্যবহার করেছে এবং প্রথমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে তার মাধ্যমে ইসলাম কায়েম করতে চেয়েছে। যা কেবল নবীদের তরীকা বিরোধী নয় বরং দুনিয়ার সকল আদর্শিক বিপ্লবের নিয়ম বিরোধী। অতি যুক্তিবাদকে প্রশ্রয় দিয়ে এই দর্শন ইসলামী আইনের দ্বিতীয় উৎস হাদীছ শাস্ত্রের প্রতি সন্দেহবাদ আরোপ করেছে।

মধ্যপন্থা

(قصد السبيل)

উপরের তিনটি চরমপন্থী মতবাদ আলোচনা শেষে এক্ষণে মধ্যপন্থা বের করা খুবই সহজ হয়ে যাবে। একজন প্রকৃত মুমিন যদি আলেম হন, তাহ'লে নিজে কুরআন-হাদীছ দেখে জীবন গড়বেন। আর যদি জাহিল হন, বা কোন বিষয় না জানা থাকে, তাহ'লে নিরপেক্ষ, যোগ্য ও মুত্তাক্বী আলেমের নিকট হ'তে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিধান জেনে নিবেন। কখনই কোন অবস্থায় কোন নির্দিষ্ট মাযহাবী ফৎওয়া বা ব্যক্তির রায় তলব করবেন না। তাহ'লে তিনি ১ম মতবাদের সংকীর্ণতা হ'তে মুক্ত হয়ে নিরপেক্ষভাবে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী নিজের জীবন, পরিবার ও রাষ্ট্র গড়ে তুলতে সক্ষম হবেন ইনশাআল্লাহ।

একজন মুমিন নিশ্চয়ই ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসাবেই বিশ্বাস করবেন। তিনি ধর্মীয় জীবনে তো বটেই, বৈষয়িক জীবনেও ইসলামের দেওয়া হুদূদ বা সীমারেখা পুরোপুরি মেনে চলবেন। আর এভাবেই তিনি ২য় মতবাদের খপপর হ'তে মুক্তি পেয়ে সার্বিক জীবনে পূর্ণ মুমিন হিসাবে নিজেকে গড়ে তুলতে সক্ষম হবেন ইনশাআল্লাহ।

একজন মুমিন অবশ্যই দ্বীন ও দুনিয়াকে একত্রে গুলিয়ে ফেলবেন না। তিনি কোন অবস্থাতেই দ্বীনকে দুনিয়া হাছিলের মাধ্যমে হিসাবে ব্যবহার করবেন না। বরং দুনিয়াকে দুনিয়া গণ্য করেই তাকে দ্বীনের রং-য়ে রঞ্জিত করতে

চেষ্টা করবেন। তিনি দ্বীনের ব্যাপারে কোন অবস্থাতেই রায় বা যুক্তিবাদকে অগ্রাধিকার দিবেন না এবং আক্বীদা ও বিধানগত ব্যাখ্যায় কখনই ছাহাবায়ে কেরামের অনুসৃত তরীকার বাইরে যাবেন না। তাহ'লেই তিনি ৩য় মতবাদের বাড়াবাড়ি হ'তে রেহাই পেতে পারেন।

অতঃপর একজন মধ্যপন্থী মুসলমান যখন যে হালেই থাকুন না কেন, নিজেকে সর্বাবস্থায় নির্ভেজাল সৎ ও দ্বীনদার হিসেবেই প্রমাণিত করবেন। দ্বীনের লক্ষ্যে তিনি দুনিয়াকে কুরবানী দিবেন এবং কোন অবস্থাতেই দুনিয়ার জন্য দ্বীনকে বিক্রি করবেন না। কুরআন ও সুন্নাহ্র মাধ্যমে প্রাপ্ত দ্বীনকেই তিনি দ্বীন হিসাবে গণ্য করবেন। কারো রায় ও কেয়াস নয়, বরং আল্লাহ্র 'অহি'কে সত্য মিথ্যার মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করবেন। তিনি ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসাবে বিশ্বাস করবেন এবং জীবনের যে শাখার সঙ্গে তিনি জড়িত হবেন, সেই শাখাতে ইসলামের বিধান মেনে চলে বাতিলের উপরে হকের বিজয় ঘটাতে চেষ্টিত হবেন। তিনি সর্বাবস্থায় দ্বীনদারগণের সাথে জামা'আতবদ্ধ থাকবেন এবং অন্যদেরকে দ্বীনের পথে দাওয়াত দিয়ে যাবেন।

যদি ইসলামী খেলাফত কায়েম থাকে, তাহ'লে সেখানে তিনি বিদ্রোহ ছড়াবেন না। বরং সরকারের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য বজায় রেখে সংশোধনের মন নিয়ে যে কোন অন্যায়ের প্রতিবাদ করবেন ও সরকারকে সুপরামর্শ দিবেন। পক্ষান্তরে যদি খেলাফত কায়েম না থাকে, তাহ'লে দেশে ইসলামী খেলাফত কায়েমের জন্য শারঈ তরীকায় যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন।

আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি!!

ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার উপায়

(طريق إقامة الخلافة الإسلامية)

মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য হ'ল আল্লাহর ইবাদত করা, অর্থাৎ সার্বিক জীবনে তাঁর দাসত্ব করা। ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হ'ল পূর্ণ নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ততার মধ্যে যাতে আল্লাহ্‌র ইবাদত সহজতর হয়। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ব্যবস্থায় একজন মুসলমান তার ব্যক্তি জীবনে স্বাধীন থাকলেও সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সে অনৈসলামী আইনে শাসিত হয় এবং মানুষের দাসত্ব করতে বাধ্য হয়। সূদ-ঘুষের পুঁজিবাদী অর্থনীতি কিংবা সমাজতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ অনুসরণের ফলে মুমিনের রূযী হারাম রূযীতে পরিণত হয়। অন্যদিকে দেশের আদালতগুলিতে ইসলামী বিধান অনুযায়ী বিচার ব্যবস্থা না থাকায় সমাজের শান্তি ও স্থিতিশীলতা ব্যাহত হয়। আর এ সকল কারণেই একজন মুমিনকে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠায় সর্বদা তৎপর থাকতে হয়। এক্ষণে ইসলামী খেলাফত কিভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায়, তার উপায়গুলি মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা যায়। - বস্তুগত ও নৈতিক ।

১. বস্তুগত উপাদান (الأسباب المادية) : এ বিষয়ে প্রথম প্রয়োজন-

(ক) ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখা : আল্লাহ বলেন, وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيْعاً وَّلاَ تَفَرَّقُواْ 'তোমরা আল্লাহ্‌র রজ্জুকে সমবেতভাবে আঁকড়িয়ে ধর এবং দলে দলে বিভক্ত হয়ো না' *(আলে ইমরান ৩/১০৩)*।

(খ) ঝগড়া পরিহার করা : আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا 'আপোষে ঝগড়া করো না, তাহ'লে হিম্মত হারিয়ে ফেলবে এবং তেজ উবে যাবে। আর তোমরা ছবর কর' *(আনফাল ৮/৪৬)*।

(গ) অলসতা পরিহার করা : وَلاَ تَهِنُوْا وَلاَ تَحْزَنُوْا وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِنْ كُنتُم مُّؤْمِنِيْنَ 'অলস হয়ো না, শংকিত হয়ো না, তোমরাই বিজয়ী, যদি তোমরা মুমিন হও' *(আলে ইমরান ৩/১৩৯)*।

(ঘ) আমীরের আনুগত্য করা : আল্লাহ বলেন, أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ 'তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং রাসূলের ও তোমাদের আমীরের আনুগত্য কর' *(নিসা ৪/৫৯)*।

(ঙ) দৃঢ়পদে সংগ্রাম করা : আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا 'হে বিশ্বাসীগণ! লড়াইয়ের সময় দৃঢ় কদম থাক' *(আনফাল ৮/৪৫)*।

(চ) শক্তি অর্জন করা : وَأَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِيْ سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُوْنَ- 'তাদের বিরুদ্ধে তোমরা সাধ্যপক্ষে শক্তি সঞ্চয় কর, ঘোড়া ইত্যাদি উপকরণের মাধ্যমে। এর দ্বারা তোমরা ভয় দেখাও আল্লাহ্‌র শত্রুদের ও তোমাদের শত্রুদের এবং তাদের বাইরে অন্যদের, যাদের তোমরা জানো না। আল্লাহ তাদের জানেন। আর যা তোমরা আল্লাহ্‌র পথে খরচ করবে, তা পুরোপুরি তোমাদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি কোনরূপ অবিচার করা হবেনা' *(আনফাল ৮/৬০)*।

২. নৈতিক উপাদান (الأسباب الروحانية) ঃ

(ক) ধৈর্যশীলতা ও **(খ) আল্লাহভীরুতা:** আল্লাহ বলেন,

إِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَيَأْتُوْكُم مِّنْ فَوْرِهِمْ هَـذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ مِّنَ الْمَلآئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ-

'যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর ও আল্লাহভীরু থাক, তবে ওরা তোমাদের দিকে অতর্কিতে এগিয়ে এলে তোমাদের প্রভু তোমাদেরকে সাহায্য করবেন পাঁচ হাযার চিহ্নিত ফেরেশতা দ্বারা' *(আলে ইমরান ৩/১২৫)*।

(গ) দৃঢ়চিত্ততা : إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلاَئِكَةُ 'নিশ্চয়ই যারা বলে 'আমাদের প্রভু আল্লাহ' এবং এ কথার উপরে দৃঢ়চিত্ত থাকে, তাদের উপরে রহমতের ফেরেশতাগণ নাযিল হবে' (*হামীম সাজ্‌দাহ ৪১/৩০)*।

(ঘ) ঈমান ও (ঙ) সৎকর্মশীলতা : وَعَدَ اللَّهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ 'আল্লাহ তা'আলা ওয়াদা করেছেন তোমাদের মধ্যকার ঐ সব লোকদের যারা দৃঢ় বিশ্বাসী হয় এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে। তাদেরকে তিনি অবশ্যই পৃথিবীতে শাসন কর্তৃত্ব দান করবেন' *(নূর ২৪/৫৫)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সময়ে আরবে ইসলামী খেলাফত কায়েমের পিছনে উপরোক্ত দু'টি কারণ বিদ্যমান ছিল। ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ্‌র মতে 'তৎকালীন আরবরা একটি বিজয়ী শক্তির গুণাবলীতে ভূষিত ছিল'। বস্তুগত উপাদানে তারা অন্যদের তুলনায় যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। কিন্তু নৈতিকতার মান তাদের দারুণ নীচু ছিল। তাদের মধ্যে বে-ঈমানী, চরিত্রহীনতা ও দলাদলি ছিল। কিন্তু এসব ত্রুটিগুলি পরে ইসলামের বরকতে বিদূরিত হয়ে যায়।

এইভাবে বস্তুগত ও নৈতিক উপাদানে বলীয়ান হওয়ার পরেই আল্লাহ পাক তাদের উপরে পুরস্কার অথবা পরীক্ষা স্বরূপ ইসলামী খেলাফত পরিচালনার গুরুভার ন্যস্ত করেন। *ফালিল্লাহিল হাম্‌দ*।

উপরোক্ত দু'টি উপাদান অর্জিত হওয়ার সাথে সাথে বাড়তি আরেকটি কারণ ঐ সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। সেটি হ'ল ঐ সময়ে জগতে নেতৃত্ব দানকারী

শক্তিগুলি তাদের নৈতিক বল হারিয়ে ফেলেছিল এবং জনসাধারণ তাদের ব্যাপারে নিরুৎসাহিত হ'য়ে পড়েছিল।[৫৭]

উপরোক্ত আলোচনায় এ কথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য নৈতিক ও বস্তুগত উভয়বিধ উপাদান অবশ্য প্রয়োজনীয়। বস্তুগত উপাদানে দু'টি শক্তি সমান হ'লে সে ক্ষেত্রে নৈতিক শক্তিতে অধিকতর বলীয়ান দলটিই জয়লাভ করবে। সূরায়ে নূর-এ উল্লেখিত আয়াতে ইসতিখলাফ-এর মধ্যেও 'ঈমান' ও 'আমলে ছালেহ'-কে খেলাফত প্রাপ্তির পূর্বশর্ত হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যারা মনে করেন শুধুমাত্র দো'আর মাধ্যমেই দেশে ইসলামী হুকূমত কায়েম হয়ে যাবে অথবা যারা ভাবেন ক্ষমতা দখলের মাধ্যমেই কেবল ইসলাম প্রতিষ্ঠা সম্ভব, এরা উভয়েই দুই চরমপন্থী ধারণার শিকার হয়েছেন। বরং যে দেশে আমরা ইসলামী আইন জারী করতে চাই, সে দেশের জনগণের মন-মানসিকতাকে আগে নির্ভেজাল ইসলামী ছাঁচে গড়ে নিতে হবে। ইসলামের প্রকৃত বুঝ হাছিল হয়ে গেলে তাদের প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রব্যবস্থা অবশ্যই ইসলামী খেলাফত হবে ইনশাআল্লাহ।

বলাবাহুল্য উপরের এই নিয়মটি কেবল ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, বরং অন্যান্য আদর্শবাদী রাষ্ট্রের বেলায়ও এ নিয়মের বাস্তবতা দেখা গিয়েছে। ফরাসী বিপ্লব, রুশ বিপ্লব, চীনা বিপ্লব সব কিছুর পূর্বে একদল নিবেদিতপ্রাণ আদর্শবাদীকে আমরা দেখেছি বছরের পর বছর ধরে নিরলসভাবে সে সব দেশের জনগণের মন-মগজ তৈরী করতে। এভাবে সমাজ বিপ্লবের মাধ্যমেই রাষ্ট্র বিপ্লব সংঘটিত হয়ে থাকে।

বর্তমান বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদ তার পুরাতন আদল পাল্টিয়ে আদর্শিক সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হযেছে। ধর্ম ও আদর্শ প্রচারের স্বাধীনতার সুযোগে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। বিভিন্ন বস্তুগত সুযোগ-সুবিধা সহ ধর্মের মিঠা বুলি শুনিয়ে তারা এদেশের গরীব জন সাধারণকে ধর্মান্তরিত করে চলেছে। দু'দিন পরে সংখ্যা কিছু বাড়লে তাদের জন্য

---

৫৭. উপরোক্ত আলোচনায় আমরা শায়খুল হাদীছ মুহাম্মাদ গোন্দলবী (গুজরানওয়ালা, পাকিস্তান) কৃত 'তানক্বীদুল মাসায়েল' বই থেকে সাহায্য নিয়েছি।- লেখক।

আলাদা একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রদেশ কিংবা স্বাধীন ভূখণ্ড দাবী করা মোটেও বিচিত্র নয়।[৫৮]

অন্যদল এদেশের মুসলিম তরুণ ও বুদ্ধিজীবীদেরকে আদর্শচ্যুত করে চলেছে। যদিও ঐসব তরুণ ও বুদ্ধিজীবীরা এদেশে মুসলিম হিসাবেই পরিচিত। উদ্দেশ্য একটাই এ দেশীয় সেবাদাসদের মাধ্যমে নতুন কায়দায় বিদেশী শাসন-শোষণ কায়েম রাখা। লেবাননে মুসলিম-খৃষ্টান দ্বন্দ্ব, শ্রীলঙ্কায় সিংহলী-তামিল দ্বন্দ্ব, আফগানিস্তানে মুজাহিদ-কম্যুনিষ্ট যুদ্ধ এরই প্রমাণ বহন করে। অমনিভাবে এদেশীয় তরুণদের মুখে ও দেওয়ালের ভাষায় বিদেশী আদর্শের পরস্পর বিরোধী শ্লোগান ও তাদের পরিবেশিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলি পরিষ্কারভাবে বিদেশী গোলামীর স্বাক্ষর বহন করে।

এমতাবস্থায় আমরা যদি নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহ্র ভিত্তিতে আমাদের দাওয়াতী ও সাংগঠনিক প্রচেষ্টা যোরদার না করি, তাহ'লে এমন দিন আর বেশী দূরে নয়, যেদিন আমরা আমাদের দেশেই বিদেশী কারাগারে বন্দী হব কিংবা নিজেদের ভাইদের হাতে বিদেশী বন্দুকের খোরাক হব।

দর্শনটির ছন্দপতন

১৯৪০-এর শেষদিকে এই তৃতীয় মতবাদটি জাতিকে কিছু বিপ্লবী কথা শুনিয়েছিল। যদিও তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিচারে এগুলিকে পাকিস্তান বিরোধিতার পক্ষে কিছু যুক্তিবাদের অবতারণা হিসাবে গণ্য করা হয়েছিল। আমরা রাজনীতির আলোকে বিচার না করে কথাগুলিকে কেবল মতবাদ হিসেবেই উপলব্ধি করতে চাই। যেমন বলা হচ্ছে,

'ইসলামী রাষ্ট্র তখনই প্রতিষ্ঠিত হইবে, যখন কুরআনের আদর্শ ও মতবাদ এবং নবী মুছতফা (ছাঃ)-এর চরিত্র ও কার্যকলাপের বুনিয়াদে কোন গণ আন্দোলন জাগিয়া উঠিবে- আর সমাজ জীবনের সমগ্র মানসিক, নৈতিক,

৫৮. ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব তিমূর যার বাস্তব প্রমাণ। সাহায্য দানের মুখোশে গরীব মুসলমানদের খৃষ্টান বানিয়ে এবং সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে উসকে দিয়ে অবশেষে ২০ মে ২০০২ সালে এ প্রদেশটিকে ইন্দোনেশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে পৃথক স্বাধীন 'রাষ্ট্র' হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

মনস্তাত্ত্বিক এবং সাংস্কৃতিক বুনিয়াদকে একটি প্রবলতর সংগ্রামের সাহায্যে একেবারে আমূল পরিবর্তন করিয়া ফেলা সম্ভব হইবে'।

আর একটু এগিয়ে যেয়ে বলা হচ্ছে, 'উপরে আমাদের বর্তমান জাতীয় চরিত্রের যে চিত্র অংকিত হইয়াছে, তাহা সম্মুখে রাখিয়া অনায়াসেই বলা যায় যে, তাহাদের ২৫/৫০ লক্ষ লোকের বিরাট ভিড় অপেক্ষা ১০জন মাত্র বিপ্লবী কর্মী ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অধিকতর কৃতিত্ব ও সাফল্যের সহিত পরিচালিত করিতে পারে।' আরও বলা হয়েছে, 'গণতান্ত্রিক নিয়ম অনুসারে দেশের ভোটদাতাদের মনোনীত ও নির্বাচিত লোকদের হাতেই অর্পিত হয় রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব; কিন্তু ভোটদাতাদের মধ্যে যদি ইসলামী মতবাদ, ইসলামী স্বভাব-চরিত্র ও দৃষ্টিভংগী এবং ইসলামী মূল্যবোধ জাগ্রত না হয়, তাহা হইলে তাহাদের ভোটে কখনই 'প্রকৃত মুসলিম' ব্যক্তি নির্বাচিত হইয়া পার্লামেন্ট বা ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য হইতে পারিবে না'।[৫৯]

কিন্তু শীঘ্রই রাজনৈতিক পরিস্থিতির চরম পরিবর্তন ঘটলো এবং পাকিস্তান আন্দোলন তুঙ্গে উঠলো। তখন ১৯৪৭-এর গোড়ার দিকের এক রচনায় ভবিষ্যতের কল্পিত ইসলামী রাষ্ট্রের আইন তৈরীর ক্ষেত্রে 'ফেকাহ শাস্ত্রে মতবিরোধের অভিযোগ'-এর জওয়াবে ইতিপূর্বে ১৯৪০-এ ছুঁড়ে মারা পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের বহু বিঘোষিত 'অধিকাংশের রায়ই চূড়ান্ত' এই থিওরীকে ডাষ্টবিন থেকে তুলে এনে ইসলামী আইনের নামে প্রচলিত মাযহাবী আইন রচনার ক্ষেত্রে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হ'ল এবং কুরআন ও সুন্নাহ্র সার্বভৌম অধিকার ক্ষুণ্ন করে তাকে কেবল বক্তৃতায় চমক সৃষ্টির জন্য ষ্টেজে রেখে দেওয়া হ'ল। যেমন বলা হয়েছে,

'ফেকাহ্র মতবিরোধ যা আছে, তা সবই বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাখ্যা, কেয়াস ও ইজতেহাদী সমস্যার ব্যাপারে'।[৬০] কথাটি একেবারেই ভিত্তিহীন। কেননা (হানাফী) ফিক্বহের মধ্যে এমন বহু মাসায়েল রয়েছে, কুরআন বা হাদীছে

৫৯. ইসলামী বিপ্লবের পথ (ঢাকা: ১ম সংস্করণ ১৯৫৪) ১৯, ২৩ ও ২৭ পৃঃ।

৬০. ইসলামী আইন কি ও কেন? পৃঃ ৩৬-৩৭, (প্রকাশক: রূপসা পাবলিকেশন্স, ৩০ সিমেট্রী রোড, খুলনা, তাবি)।

যার কোন অস্তিত্ব নেই।[৬১] আর এটা জানা কথা যে, যেসব ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে দলীল পাওয়া সম্ভব, যে সব ক্ষেত্রে ইজতেহাদ অচল। এরপরে বলা হয়েছে, 'কোন আলেম যদি শরী'আতের বিধানের ব্যাখ্যা পেশ করেন, কোন ইমাম যদি স্বীয় ইজতেহাদ ও কেয়াসের বলে কোন সমস্যার সমাধান করেন কিংবা কোন মুজতাহিদ যদি ইসতিহসানের ভিত্তিতে কোন বিষয়ে ফৎওয়া প্রদান করেন, তা সাথে সাথেই ইসলামী রাষ্ট্রের আইনে পরিণত হয় না। বরং মূলতঃ তার ধরন হচ্ছে একটি প্রস্তাবের মতই। আইনে পরিণত হয় তখন, যখন তার উপর যুগের ফকীহদের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয় অথবা তাদের অধিকাংশ তাকে গ্রহণযোগ্য বলে মেনে নেন এবং তার ওপরই ফৎওয়া প্রদত্ত হয়।'

উপরোক্ত আলোচনায় একথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, এই দর্শন মাত্র কিছুদিন যেতে না যেতেই তার বিপ্লবী চরিত্র হারিয়ে ফেলে এবং আর পাঁচটি পাশ্চাত্যপন্থী গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলের ন্যায় 'মেজরিটির' পূজারী হয়ে পড়ে। অন্যান্য দল তাদের রাজনৈতিক আদর্শ হিসাবে কেউ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বা কেউ সমাজতন্ত্রকে গ্রহণ করে। সেইভাবে উপরোক্ত দর্শনের অনুসারী দলটি ইসলামকে বেছে নেয়। ১৯৬৪-এর নির্বাচনে ধর্মনিরপেক্ষ ও বামপন্থী দলগুলির সঙ্গে একই কাতারে থেকে এই দলটি ইসলামী নীতির বাইরে বয়সোত্তীর্ণ একজন সম্মানিতা মহিলাকে পাকিস্তানের 'প্রেসিডেন্ট' হিসাবে সমর্থন দেয়। দুর্ভাগ্য এই যে, অন্যান্য দল তাদের আপোষে মারামারি কাটাকাটিকে রাজনৈতিক ব্যাপার হিসাবে গণ্য করলেও এই দলটি কিন্তু সরকারী যুলুম-নির্যাতন ও অন্যান্য দলের হাতে মার খাওয়াকে নিজের 'হক' হওয়ার পক্ষে দলীল হিসাবে প্রচার করতে থাকে। নিজেদের মিছিলগুলিকে জিহাদের মিছিল এবং নিজেদের নিহত লোকদেরকে 'শহীদ' হিসাবে চালিয়ে দিতে থাকে। অথচ মুসলমানের হাতে মুসলমান মরলে সে 'শহীদ' হিসাবে গণ্য হয় না।[৬২]

---

৬১. এ ব্যাপারে ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর সাক্ষ্য শ্রবণ করুন এবং আপাততঃ পঞ্চাশটি মাসআলা নমুনা স্বরূপ দেখুন। -তরীক্বে মুহাম্মাদী (করাচী-৬; মাকতাবা মুহাম্মাদীয়া, তাবি) পৃঃ ১৩৬-১৫৪।

৬২. আল-ইমামাতু ওয়াস সিয়াসাহ ১/২৩১ পৃঃ ১৮ লাইন ليس فى الإسلام شهادة ولكنها الندباء

এই দর্শনের অনুসারীগণ কয়েক বৎসর 'অরাজনৈতিক' থাকার পর নিজেদেরকে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি রাজনৈতিক দল হিসাবে ঘোষণা করেন। ১৯৫৬ সালে সমগ্র দেশে যখন ইসলামী শাসনতন্ত্রের পক্ষে গণজোয়ার সৃষ্টি হ'তে চলেছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে হঠাৎ একদিন এই দলটির মাননীয় দার্শনিক নেতা পত্রিকায় বিবৃতির মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন যে, যেহেতু পাকিস্তানে হানাফী মাযহাবের অনুসারী লোকসংখ্যা বেশী, সেহেতু এদেশে 'হানাফী ফিকহ' অনুযায়ী ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালিত হবে'।[৬৩]

ব্যস! অখণ্ড জাতীয় ঐক্য ভেঙ্গে খান্‌খান হয়ে গেল। ইসলামী শাসনতন্ত্র তার প্রতিষ্ঠার দোরগোড়া হ'তে ফিরে গেল। ঠিক একই অবস্থা হয়েছে বর্তমান পাকিস্তানী প্রেসিডেন্ট যিয়াউল হকের আমলে। সেখানে প্রেসিডেন্টের আবেদন ক্রমে অন্যান্য দলের ন্যায় ইসলামী আন্দোলনের ঝাণ্ডাবাহী উক্ত দর্শনের অন্ধ অনুসারী দলটি সরকারের নিকট যে 'শরী'আত বিল' পেশ করেছে, তাতে '৫৬ সালের সেই প্রস্তাবেরই পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। কয়েকটি ধারা সম্বলিত উক্ত খসড়া 'শরী'আত বিল'-এর ২(খ) ধারায় চিরাচরিত নিয়মানুসারে কুরআন ও সুন্নাহকে ইসলামী আইনের মূল উৎস হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু ৮ম ধারায় গিয়ে বলা হয়েছে,

مسلمه اسلامى فرقوں كے شخصى معاملات ان كے اپنے فقهى مسلك كے مطابق طے كئے جائينگے-

'গৃহীত ইসলামী ফের্কাগুলির ব্যক্তিগত বিষয়াবলীর সমাধান তাদের নিজ নিজ মাযহাবী ফিক্বহ অনুযায়ী করা হবে'।[৬৪] সে দেশের 'সম্মিলিত সুন্নী পরিষদ' পাকিস্তানে হানাফী আইন চালু না করলে দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে বলে সরকারকে হুঁশিয়ার করে দেয়'।[৬৫]

জুলাই '৮৫-তে এই খসড়া 'শরী'আত বিল' পেশ করার পর শী'আ মতাবলম্বীরা তাদের অনুসরণীয় 'জাফরী ফিক্বহ' রাষ্ট্রীয় মাযহাব হিসাবে চালু

---

৬৩. সাপ্তাহিক 'আল ই'তিছাম' লাহোর, ৩৫ বর্ষ, ২৬ সংখ্যা, ৩৭ বর্ষ ১১ সংখ্যা; 'আল-ইসলাম' ১৩ বর্ষ ২৩ সংখ্যা।

৬৪. মাজাল্লা আহলে হাদীছ (হরিয়ানা, ভারত) ২১ জুলাই সংখ্যা ১৯৮৫ ইং।

৬৫. সাপ্তাহিক 'আল-ই'তিছাম' লাহোর ৩৭ বর্ষ ১৮শ সংখ্যা, ১৩পৃঃ ২৯শে নভেম্বর ১৯৮৫ ইং।

করার জন্য পাকিস্তান সরকারের নিকট দাবী তুলেছে। এছাড়াও খোদ হানাফী মাযহাব প্রধানতঃ ব্রেলভী ও দেউবন্দী দু'দলে বিভক্ত। এরপরও রয়েছে বিভিন্ন তরীকার বিভিন্ন নিয়ম-কানূন। বিল পেশকারী দলটি নিজেও একটি ফিরকা। তার রয়েছে নিজস্ব দর্শন ও চিন্তাধারা। হানাফী ফিকহের অনুসারী হ'লেও খোদ হানাফী মাযহাবের বড় বড় আলেমগণ এই দলের বাইরে রয়ে গেছেন। কেউ ঢুকে বেরিয়ে এসেছেন। এমনকি স্বগোত্রীয় কেউ কেউ এই চরমপন্থী দলটিকে 'খারেজী' বলেছেন এবং নিজ নিজ অনুসারীদেরকে এই দলের সংস্পর্শে না যাওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন।[৬৬] এক্ষণে দেশে 'গৃহীত' ইসলামী ফের্কার সংখ্যা যে কয়টি, তা নির্ধারণ করাও রীতিমত একটি গবেষণার বিষয় বৈ-কি।

পাকিস্তানী সহযোগীদের সুরে সুর মিলিয়ে উক্ত দর্শনের অনুসারী বাংলাদেশী দলটির প্রধান সকল রাখ-ঢাক ছেড়ে '৮৬-এর গোড়ার দিকে সংবাদপত্রের মাধ্যমে দেশবাসীকে একই কথা শুনিয়ে দিয়েছেন এবং এখনও বিভিন্ন সাংগঠনিক বৈঠকে তিনি বা তাঁর কর্মীরা উক্ত বক্তব্যের সমর্থনে ছাফাই গেয়ে চলেছেন। বক্তব্যটি নিম্নরূপ:[৬৭]

প্রশ্ন: যে দেশে বিভিন্ন মাযহাবের লোক বাস করে, সে দেশে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কোন মাযহাবের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে?

জবাব : দেশে যে মাযহাবের লোকসংখ্যা বেশী সে মাযহাব অনুযায়ী সেখানে শাসন ব্যবস্থা হওয়াই স্বাভাবিক। তবে বিবাহ, তালাক, ফারায়েজ ইত্যাদি ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয়ে প্রত্যেক মাযহাবের যার যার মাযহাব অনুযায়ী জীপন যাপন করার শাসনতান্ত্রিক নিশ্চয়তা থাকবে।'

'৫৬, '৮৫ এবং '৮৬-এর বক্তব্যগুলিতে কি চমৎকার মিল! একেই তো বলে 'হাতীর বাইরের দু'টি দাঁত দেখানোর জন্য, আর ভিতরের দু'টি দাঁত চিবানোর জন্য'। শ্লোগানের সময় বলা হয়, 'সব সমস্যার সমাধান আল-

৬৬. মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী একে 'খারেজী' আন্দোলন বলেছেন। মাওলানা হোসায়েন আহমাদ মাদানী, মাওলানা আহমদ আলী সাহারানপুরী, মাওলানা আতাউল্লাহ শাহ বুখারী একে 'হানাফী' বলে স্বীকার করেননি। দেখুন মাসিক তর্জুমানুল হাদীছ, ঢাকা (অধুনালুপ্ত) ৭ম বর্ষ ১৪৭-৪৮ পৃঃ।

৬৭. ঢাকা, সাপ্তাহিক সোনার বাংলা, ৩১ শে জানুয়ারী ১৯৮৬।

কুরআন, আল-কুরআন।' কিন্তু এখন ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয়ের সমাধান দিতে কুরআন বা ইসলাম কি অপারগ হ'ল? হায়রে তাক্বলীদ! হায়রে মাযহাব! এদের তো উচিত ছিল মহামতি ইমাম মালেক (রহঃ) থেকে শিক্ষা নেওয়া। ব্যবহারিক মতপার্থক্যের অজুহাত দেখিয়ে আব্বাসীয় খেলাফতের প্রতিষ্ঠাতা খলীফা মানছূর যখন 'মালেকী ফিক্বহ'কে রাষ্ট্রীয় মাযহাব হিসাবে চালু করার জন্য স্বয়ং ইমাম মালেকের নিকট অনুমতি চাইলেন, ইমাম মালেক (রহঃ) তখন পরিষ্কারভাবে খলীফা মানছূর ও পরবর্তীতে খলীফা হারূনুর রশীদের অনুরূপ প্রস্তাব নাকচ করে দেন।[৬৮] বলাবাহুল্য অমিত শক্তিধর রাজতন্ত্রী খলীফা হওয়া সত্ত্বেও মানছূর ও হারূণ এই ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হ'তে বিরত ছিলেন।

আমরা বুঝতে পারি না, যে দেশের মুসলমান এখনও ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসাবে মেনে নিতে পারেনি। যারা গর্ব করে বলে 'আমি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কম্যুনিষ্ট কিন্তু ধর্মীয় ক্ষেত্রে পাক্কা মুসলমান, যে দেশের অধিকাংশ মুসলমান বাপ-দাদার আমল থেকে চলে আসা রেওয়াজকেই ইসলাম ভাবতে অভ্যস্ত, যে দেশ ইসলামের নামে রকমারি শিরক ও বিদ'আতে ভরা, সে দেশের ভোটারদের মাধ্যমে রেওয়াজী ইসলাম ছাড়া কুরআন ও সুন্নাহ্র প্রকৃত ইসলাম কায়েম হওয়া কেমনে সম্ভব? বন্ধুরা বোধ হয় সে কারণে লাজ-লজ্জা ছেড়ে আসল কথাটাই ফাঁস করে দিয়েছেন। কিন্তু সমস্যা তো একটা থেকেই যাচ্ছে। সেটা হ'ল গৃহীত দুই ইসলামী ফের্কার দু'জন মুসলমানের মধ্যে কোন বিষয়ে ঝগড়া হ'লে এবং তাদের অনুসরণীয় ফিক্বহী সিদ্ধান্ত দু'রকমের হ'লে ইসলামের নামে পরিকল্পিত সেই 'মাযহাবী রাষ্ট্রে'র বিচারক কোন পক্ষে রায় দিবেন? যদি দু'পক্ষকেই সঠিক বলেন, তাহ'লে ঝগড়া মিটবে কিসের ভিত্তিতে? এর সমাধান তো পবিত্র কুরআনে বহু পূর্বেই দেয়া হয়েছে।-

فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ–

'যদি তোমরা কোন বিষয়ে ঝগড়া কর, তাহ'লে আল্লাহ এবং রাসূলের দিকে ফিরে যাও' *(নিসা ৪/৫৯)*। বুঝা গেল ঝগড়া মীমাংসার ভিত্তি হবে

৬৮. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, মিসরী ছাপা, ১/১২৮ পৃঃ।

কুরআন ও সুন্নাহ, কোন মাযহাবী সিদ্ধান্ত নয়। যিনি যে দলেই থাকুন না কেন, কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র সিদ্ধান্ত তাকে নিঃশর্তভাবে মেনে নিতে হবে। বলা বাহুল্য, মুসলিম ঐক্যের ভিত্তি হ'ল একমাত্র এটাই এবং আহলেহাদীছ আন্দোলনের মূল দাওয়াতও এটাই। আমরা বলব, সত্যিকারের বিপ্লবী ও আদর্শবাদী যারা হবেন, তাঁরা কখনই সংখ্যা পূজারী হবেন না, বরং সত্য পূজারী হবেন। وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ 'তুমি লোকদের ভয় পাও, অথচ আল্লাহ বড় হকদার তাকে ভয় পাবার জন্য' *(আহযাব ৩৩/৩৭)*।

উপসংহার

পরিশেষে আমরা বলতে চাই যে, মানব সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য হ'ল আল্লাহ্র ইবাদত বা তাঁর দাসত্ব করা। আমাদের সার্বিক জীবনে নির্বিঘ্ন পরিবেশে সেই ইবাদতের প্রতিফলন ঘটানোর জন্যই প্রয়োজন ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার। মনে রাখতে হবে যে, আমাদের মূল লক্ষ্য হ'ল ইবাদত প্রতিষ্ঠা, হুকূমত প্রতিষ্ঠা নয়। আমাদেরকে সেই লক্ষ্যে অবিচল থাকতে হবে। বিগত যুগের প্রত্যেক শাসন শক্তি যেহেতু নিরংকুশভাবে আল্লাহ্র ইবাদতকে বরদাশত করেনি, তাই তাদের সঙ্গে নবীদের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। বর্তমানেও যারা সেই নিরংকুশ ইবাদতের ডাক দিবেন, নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহ্র প্রতি আহ্বান জানাবেন, ধর্মীয় ও বৈষয়িক জীবনে আল্লাহ প্রেরিত ও রাসূল (ছাঃ) প্রদর্শিত অভ্রান্ত হেদায়াত অনুসরণের দাওয়াত দিবেন, তাদেরকেও এ যুগের বুদ্ধিজীবি, সমাজনেতা, ধর্মনেতা ও রাষ্ট্রনেতাদের পক্ষ থেকে প্রবল বাধার সম্মুখীন হতেই হবে বা হচ্ছে। এ বাধাকে অতিক্রম করে দুর্বার গতিতে নবীদের রেখে যাওয়া পবিত্র মিশনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই হবে প্রকৃত 'জিহাদ'।

ইতিপূর্বে আলোচিত তিনটি মতবাদ সম্পর্কে হুঁশিয়ার থেকে সর্বাত্মক সমাজ বিপ্লবের লক্ষ্যে কথা, কলম ও সংগঠন এই ত্রিমুখী হাতিয়ার নিয়ে আমাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। কিতাব ও সুন্নাতের আলো নিয়ে জাহেলিয়াতের নিকষ কালো আঁধারের বুক চিরে মানবতার সার্বিক কল্যাণে

আমাদের প্রিয়তম সবকিছুকে উৎসর্গ করতে হবে। তবেই আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য সার্থক হবে বলে আমরা মনে করি। আসুন! আমরা অভ্রান্ত সত্যের উৎস আল্লাহ প্রেরিত অহিয়ে মাত্লু ও গায়ের মাত্লু পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ঘুণেধরা সমাজকে ঢেলে সাজানোর উদ্দেশ্যে একদল নিবেদিতপ্রাণ তরুণ মুজাহিদ আল্লাহ্র নামে প্রস্তুত হয়ে যাই। সত্যসেবীদের একটি জামা'আত তৈরী হয়ে যাই। আল্লাহ আমাদের কবুল করুন- আমীন!!

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ- (التوبة ١١٩)-

'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাক' *(তওবা ৯/১১৯)*।

অন্ধ ব্যক্তিপূজা, ধর্মহীন রাজনীতি এবং রাজনীতিই ধর্ম- এই তিনটিই চরমপন্থী মতবাদ। আসুন! এসব থেকে বিরত হই এবং জীবনের চলার পথে আমরা ছিরাতে মুস্তাক্বীমের অনুসারী হই!!

মানুষের সার্বিক জীবনকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে পরিচালনার গভীর প্রেরণাই হ'ল আহলেহাদীছ আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি।

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا انت استغفرك وأتوب إليك-

اللهم اغفرلي ولوالديّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب-